গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

ISSN 2582-5674

বর্ষ - ১৮ যুগ্ম সংখ্যা-২, ৩ মার্চ-জুন ২০২১ RNI : WBBEN/2003/11192 মূল্য : ১৫ টাকা

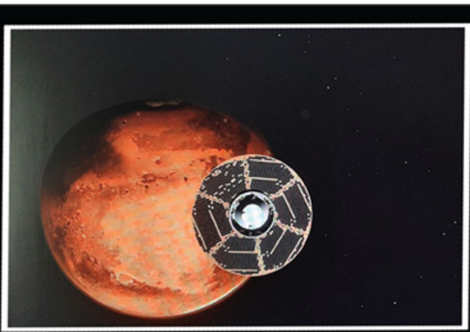

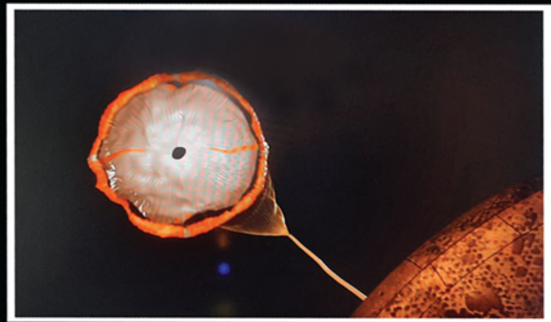

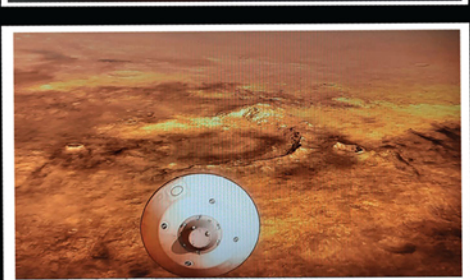

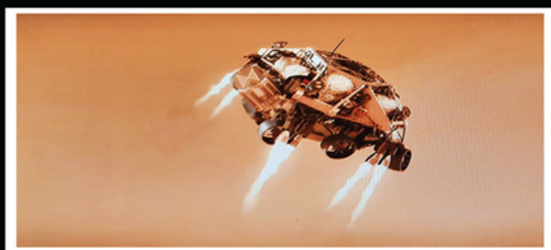

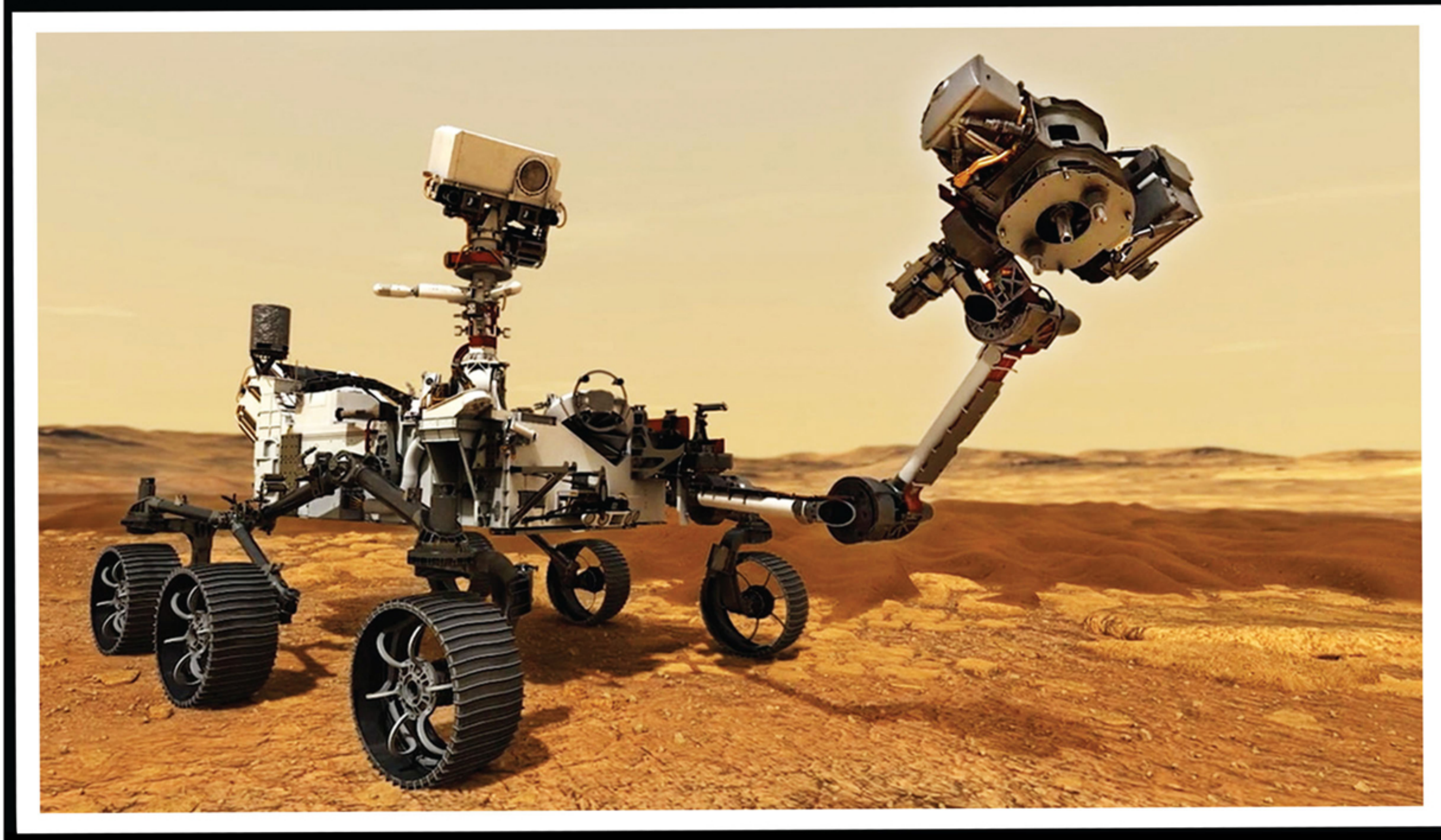

সূচি

১ আমাদের কথা

২ ভিটামিন সি অমিতাভ চক্রবর্তী

৪ বুমেরাং নীহারিকা তন্ময় ধর

৫ হিজল জয়শ্রী দত্ত

৬ ঢেউয়ের তালে ভুবন দোলে পল্লব রায়গুপ্ত

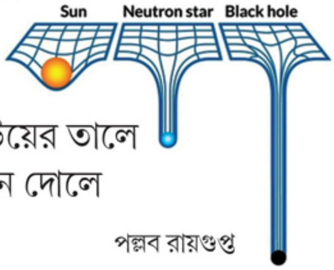

১২ স্টেম সেল রোগ সারাবে অজয় মজুমদার

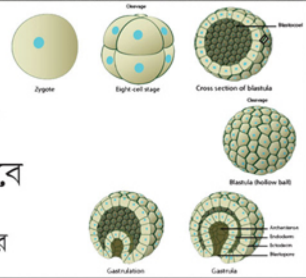

১৪ প্রাণের খোঁজে পার্সিভেয়ারেন্স অনিন্দ্য দে

১৯ বোটক্স কি ও কেন? অনিন্দিতা জোয়ারদার

২১ বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় জ্যোতিষী চর্চা গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

২২ কালোকথা অরিজিৎ শূর

২৩ টিকা-নির্ভর হার্ড ইমিউনিটি সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

২৪ কাগজের তৈরি কাপে চা পানের বিপদ কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬ স্বতঃস্পন্দন জগদীশ চন্দ্র বসু

২৭ সংবাদ পরিবেশ কর্মশালা

২৮ কবিতা
কল্যাণ মিত্র
রথীন্দ্রনাথ ভৌমিক
জগন্ময় মজুমদার
সুনীল শর্মাচার্য
নির্মাল্য দাশগুপ্ত
শ্যামল কুমার বিশ্বাস

৩০ করোনা কালে জরুরি বই সুমিত্রা চৌধুরী

৩১ ব্র্যান্ড ওষুধ বনাম জেনেরিক ওষুধ প্রবীর বসু

৪র্থ প্রচ্ছদ যারা হারিয়ে যাচ্ছে রাজা রাউত

সুভাষিতম্

‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল প্রশ্ন করা না থামানো।’

—আইনস্টাইন

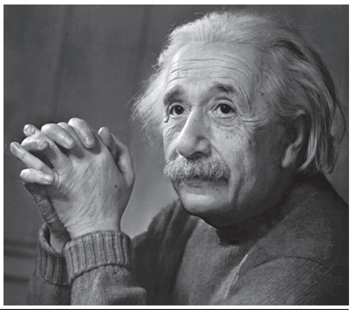

বিজ্ঞান অন্বেষক

সম্পাদক
তাপস মজুমদার

সম্পাদকমণ্ডলী
জয়দেব দে, বিজয় সরকার, শিবপ্রসাদ সর্দার, জগন্ময় মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, অনিন্দ্য দে, রতন দেবনাথ, পান্না মানি, অনুপ হালদার, সুবিনয় পাল, প্রবীর বসু, সৌরভ মুখার্জী

: website :
www.ssu2011.com/bigyan-anneswak

: e-mail :
1.bigyanannesak1993@gmail.com.

: Whatsapp No. :
9874778216 / 9143264159

প্রচ্ছদ বিন্যাস অঙ্গসজ্জা
তাপস মজুমদার
অঙ্কন
সৌরভ মুখার্জী

আমাদের কথা

আমরা যা চাই

আমরা চাই—
মানুষের চিন্তা ও স্বপ্নের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক
যুক্তি ও বিজ্ঞান।
আমরা চাই—
কৃষক তার পরিশ্রম ও পরিশ্রমের মাঝে
কথায় কথায় আনুক সৃষ্টি ও সালোকসংশ্লেষ।
আমরা চাই—
ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় শ্রমিকের হাতুড়ি যখন ঠং ঠং
তখন তাঁর ভাবনায় আসুক নিউটন নিউটন।
আমরা চাই—
খেলোয়াড় তাঁর উল্লম্ফন অভ্যাসের ফাঁকে
মাধ্যাকর্ষণরোধি গণিত চিন্তা করুক।
আমরা চাই—
রাধুনি তাঁর স্ফুটন বিদ্যা কাজে লাগাক
শক্তি সংরক্ষণে।
আমরা চাই—
একসাথে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা
বিজ্ঞানের ক্লাস করুক।
আমরা চাই—
বিজ্ঞান যুক্তির ছাঁকনিতে সিদ্ধ হোক
ঈশ্বর অথবা না-ঈশ্বরের অস্তিত্ব।
আমরা চাই—
মানুষ ‘বৈজ্ঞানিক পরামর্শ’ দিক
স্বপ্নের ল্যান্ডারকে মঙ্গলে নামাক।

বিজ্ঞান যুক্তি স্বপ্ন চিন্তা এক হয়ে যাক।

—তাপস মজুমদার

বি.দ্র. : করোনার থাবা প্রসারিত হচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের দ্বিমাসিক সংখ্যাটি যুগ্মসংখ্যায় প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছি। এইজন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদকমন্ডলী

ISSN 2582-5674
9 772582 567004

বিজ্ঞান অন্বেষকের পক্ষে জয়দেব দে, ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত এবং স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
যোগাযোগ : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২/৯২৩১৫৪৫১৯১

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী

দেহের আবশ্যিক উপাদান ভিটামিন সি

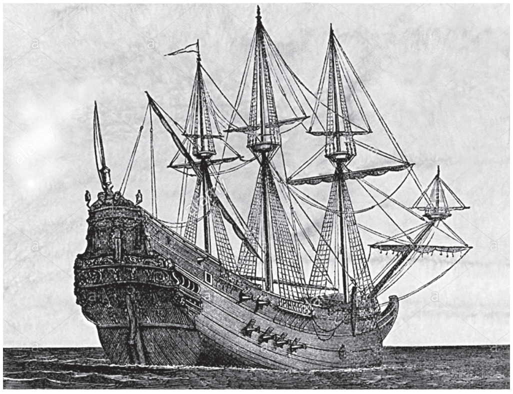

পর্তুগীজ নাবিক ফারদিনান্দ ম্যাজেলান-এর কথা তো ছোটবেলায় সবাই পড়েছি। ১৫১৯ থেকে ১৫২২ খ্রিস্টাব্দ, তিন বছরের এই সমুদ্রযাত্রায় ম্যাজেলান গোটা পৃথিবী ঘুরে এসেছিলেন এক চক্কর। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের অভিযানে প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁর অধিকাংশ সঙ্গী। এমনকি ভাস্কো দা গামাও ভারতে আসার আগে ১৪৯৭ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অভিযানে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর ১৬০ জন সঙ্গীর মধ্যে শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছিল যাত্রাপথে। ইউরোপের নাবিকরা তখন বিশালাকার সব নৌবহর সাজিয়ে মশলার খোঁজে পাড়ি দিচ্ছেন অজানার পথে। নতুন জলপথ ধরে অনেকেই হয়ত পৌঁছে যাচ্ছেন কোনো নাম না জানা দেশে। কিন্তু এই অভিযানগুলি ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। একেকটি অভিযান, তা সে সফল হোক বা নাই হোক, কেড়ে নিত বহু প্রাণ। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণগুলিও যেন প্রায় একই রকম। হাত-পা-এর পেশী ফুলে গিয়ে প্রচণ্ড ব্যাথা ছাড়াও দাঁতের মাড়ি ও নাক থেকে গড়িয়ে পড়ত রক্ত। সমস্যা আরও গভীর হয়ে উঠলে থ্যাতলানো মাড়ি থেকে খুলে আসত একের পর এক দাঁত। প্রচণ্ড শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে দেখা দিত ডায়রিয়া, ফুসফুস এবং যকৃতের সমস্যা। পরিণাম—যন্ত্রণাদায়ক অবধারিত মৃত্যু। স্কার্ভি নামক এই মারাত্মক অসুখ তখন সমুদ্রযাত্রীদের কাছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের চেয়েও বড় আতঙ্কের। ১৫৯৩ সালে স্যার রিচার্ড হকিন্স নামে এক ব্রিটিশ নেভি অ্যাডমিরাল-এর দাবি অনুযায়ী তাঁর নিজের অভিজ্ঞতায় সমুদ্রযাত্রায় স্কার্ভিজনিত কারণে মৃত্যুর সংখ্যা দশ হাজারেরও বেশি।

প্রতিকার খুঁজছিলেন অনেকেই। এমনকি তাদের একটা অংশ এমন ধারণাও করেছিলেন যে লেবুর রস এই রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে পারে। ১৬১৭ সালে জন উডাল (John Woodall) নামে এক ব্রিটিশ সার্জেন-এর লেখা The Surgeon's Mate বইতে স্কার্ভির প্রতিরোধ ও প্রতিকারে লেবুর রসের বিশেষ ভূমিকার কথা বলা হয়েছে। তবে এসব কথাই তাঁরা বলতেন অনেকটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। ঠিক ত্রিশ বছর বাদে জেমস লিন্ড নামে এক স্কটিশ নেভি সার্জেন স্কার্ভি আক্রান্ত রোগীদেরকে নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা করলেন। তিনি মোটামুটিভাবে একই ধরনের সমস্যা যুক্ত বারোজন রোগীকে বেছে নিলেন। দুজন করে ছয়টি গ্রুপে ভাগ করলেন তাদের। নরম বিস্কুট, বার্লি প্রভৃতি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবারের সঙ্গে তালিকায় রাখলেন মাংসের ভর্তা। এই সাধারণ খাবারের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রুপকে দিতে শুরু করলেন সামান্য পরিমাণ বিশেষ খাবার। বিশেষ খাবার হিসাবে কোনো গ্রুপকে ফলের রস, কোন গ্রুপকে একই পরিমাণ সমুদ্রের নোনাজল, আবার কোন গ্রুপকে জায়ফল, সর্ষে, রসুন প্রভৃতি থেঁতো করে তার নির্যাসমিশ্রিত জল প্রভৃতি দিলেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে সরাসরি মানুষকে গিনিপিগ বানিয়েই চলছিল পরীক্ষা। দিন কয়েকের মধ্যেই ফল মিলল হাতেনাতে। সৌভাগ্যবশত ফলের রস খেতে পাওয়া রোগীরা সেরে উঠেছিলেন দ্রুত। প্রায় একই সময়ে জেম্‌স কুক (James Cook) নামে এক জাহাজের ক্যাপ্টেন গ্রহণ করলেন এক অভিনব পদক্ষেপ। সফরসঙ্গীদের স্কার্ভিমুক্ত রাখতে বিশেষ খাদ্যতালিকার পাশাপাশি খুব জোর দিলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে। জাহাজের প্রত্যেক কর্মীকে নিয়মিত তাদের জামাকাপড় ও ডেকের বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার করতে হত। কোথাও যেন এতটুকু ছত্রাক বা জীবাণু না জন্মায়। কখনো টাটকা ফল ও সব্জির অভাব থাকলে খাদ্যতালিকায় অবশ্যই থাকত সিলারি গ্রাস বা অন্য কোনো স্থানীয় ঘাস-লতাপাতা। তখন ১৭৭০ সাল। নর্দান কুইন্সল্যান্ডের কাছাকাছি অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার কবলে পড়েও তাঁর জাহাজ 'এন্ডেভর' কোনোরকম প্রাণহানি ছাড়াই ফিরে এসেছিল। ফুটো হয়ে যাওয়া জাহাজের পাটাতন থেকে জল বের করে

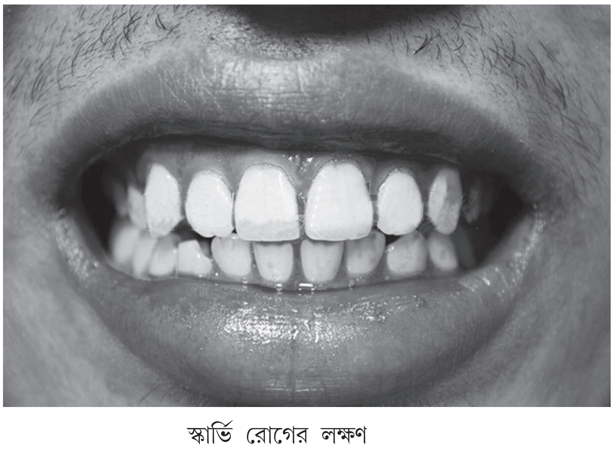

স্কার্ভি রোগের লক্ষণ

ভিটামিন সি-এর বিভিন্ন উৎস

মেরামত করতে প্রায় তেইশ ঘন্টার অমানুষিক পরিশ্রম করেছিলেন নাবিকরা। আসলে কুকের কড়া নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সেই অভিযানে একজন নাবিকও স্কার্ভিতে আক্রান্ত হননি। এই সাফল্যের জন্য সেই বছর রয়্যাল সোসাইটি তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মান, 'কোপলে মেডেল' দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল জেম্‌স কুককে।

কিন্তু কি এমন আছে টাটকা ফল বা শাকসব্জিতে, যা এই ভয়ঙ্কর অসুখ থেকে মানুষকে রক্ষা করে? অসুখ এবং তাঁর থেকে মুক্তির সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও নির্দিষ্ট সেই পদার্থটিকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না কেউই। এদিকে পেরিয়ে গেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে বছর দশেক আগে। ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা তখনো অশান্ত। অথচ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নিরিখে সে এক সোনালি সময়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা ও আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব পাল্টে দিয়েছে সনাতন পদার্থবিদ্যার ধারণা। তখন ১৯২৮ সাল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছিলেন অ্যালবার্ট স্যুজান-গিয়োজি (Albert Szent-Györgyi) নামে এক হাঙ্গেরিয়ান যুবক। তিনি একাধারে ডাক্তার ও জৈবরসায়নবিদ। দীর্ঘ প্রচেষ্টায় গবাদিপশুর অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স (বৃক্কের কাছে অবস্থিত অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির চর্বিযুক্ত আভ্যন্তরীণ অংশ) থেকে সামান্য পরিমাণ (এক গ্রামেরও কম) কেলাসিত পদার্থ আলাদা করতে সমর্থ হলেন তিনি। স্যুজান-গিয়োজি ভাবলেন তিনি সুগারের মত গঠনযুক্ত কোনো নতুন হরমোন খুঁজে পেয়েছেন। তিনি এই পদার্থটির নাম রাখলেন ইগ্‌নোজ (Ignose)। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল আনবিক সংকেতে ছয়টি কার্বনযুক্ত এই নতুন পদার্থটি আদতে একটি অ্যাসিড, তখন এর নাম রাখা হল হেক্সাইউরিক অ্যাসিড ($C_6H_6O_6$)। প্রায় বছর চারেক সময় লেগেছিল নিশ্চিত হতে যে, এই হেক্সাইউরিক অ্যাসিড-ই আসলে ভিটামিন সি, যার অভাবের কারণেই বিগত কয়েক শতক ধরে সমুদ্র অভিযানকারী নাবিকরা আক্রান্ত হতেন মারাত্মক স্কার্ভি রোগে। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দেওয়া যেতেই পারে যে, Vitamin C নামটিতে C অক্ষরটি আসলে নির্দেশ করে যে, তৃতীয় ভিটামিন হিসাবে গবেষকরা একে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

অ্যালিবার্ট স্যুজান গিয়োজি

এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থটির রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পেতে চাইলেন বিজ্ঞানীরা। আজকালকার দিনে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি অবলম্বনে খুব অল্প পরিমাণ বিশুদ্ধ যৌগ থেকেই সঠিক আনবিক গঠন জেনে ফেলা সম্ভব হলেও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তা কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না। দরকার হত প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ কেলাসের। স্যুজান-গিয়োজি দেখলেন হাঙ্গেরিতে প্রতিদিনের রান্নায় যে লঙ্কা ব্যবহৃত হয় তাতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা তা পৃথক করাও যায় তুলনামূলক সহজ উপায়ে। অন্যদিকে বিভিন্ন ফলের রসে ভিটামিন সি থাকলেও সেখানে একাধিক শর্করার (সুগার) উপস্থিতির জন্য বিশুদ্ধ ভিটামিন সি আলাদা করা কষ্টকর। এক সপ্তাহের মধ্যেই লঙ্কা থেকে প্রায় ১ কিলোগ্রামের মতো বিশুদ্ধ ভিটামিন সি-র কেলাস তৈরি করে ফেললেন স্যুজান-গিয়োজি। সেই কেলাস নিয়ে গবেষণা করে বারমিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক নরম্যান হাওয়ার্থ বের করে ফেললেন ভিটামিন সি-র আনবিক গঠন। হেক্সাইউরিক অ্যাসিড বিজ্ঞানী মহলে পরিচিত হল অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড হিসাবে। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৩৭ সালে স্যুজান-গিয়োজি পেলেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সম্মানীয় নোবেল পুরস্কার। আর হাওয়ার্থ নোবেল পুরস্কার পেলেন রসায়নে।

কুকুর, বেড়াল প্রভৃতি অন্যান্য প্রাণীদেহের যকৃতে সহজেই গ্লুকোজ থেকে অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয় বলে এদের খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি না থাকলেও চলে। কয়েকটি জৈবরাসায়নিক ধাপে গ্লুকোজ থেকে ভিটামিন সি সংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াটি এদের যকৃতে সম্পন্ন হয়। এই পর্যায়ে প্রথমে গ্লুকোজ থেকে উৎপন্ন গ্লুকোরোনিক অ্যাসিড প্রয়োজনীয় উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিজারিত হয়ে গুলোনিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। তারপর গ্লুকোরেনিক অ্যাসিড ল্যাক্টোনেজ উৎসেচকের সাহায্যে বলয়াকার গুলেনোল্যাক্টোন তৈরি করে, যা শেষ ধাপে গুলোনোল্যাক্টোন অক্সিডাইজিং এনজাইমের উপস্থিতিতে অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড-এ পরিণত হয়। তবে মানুষ ছাড়া

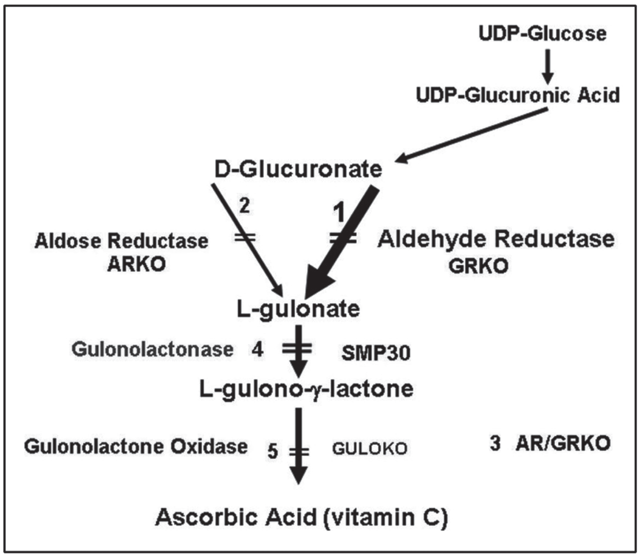

অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড প্রস্তুতির ধাপ

অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে শিম্পাঞ্জি, গিনিপিগ এবং ভারতীয় ফলাহারী বাদুর, মোটামুটিভাবে এই কয়েকটি প্রাণীর খাদ্যতালিকায় ভিটামিন সি থাকা আবিশ্যিক। কারণ দীর্ঘ সময়ের প্রাকৃতিক অভিযোজনের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত প্রাণীর জিন-এ এমন কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে যে, ভিটামিন সি সংশ্লেষণের শেষ ধাপটি আর এদের দেহে ঘটে ওঠে না।

কোলাজেন নামক প্রোটিন তৈরিতে ভিটামিন সি-র ভূমিকা খুবই

গুরুত্বপূর্ণ। পেশীর যোজক কলা (tissue)-য় কোলাজেনের অনুপস্থিতিতে পেশী দুর্বল ও নরম হয়ে স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা হারায়। ফলে মাড়ি আলগা হয়ে দাঁত পড়ে যাওয়া এবং দেহের বিভিন্ন পেশী ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে ওঠার মত স্কার্ভির লক্ষণগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। অন্যদিকে স্নায়ুবিজ্ঞান থেকে শুরু করে পুষ্টিবিজ্ঞান, ক্যান্সার, এন্ডোক্রিনোলজি, ইমিউনোলজি প্রভৃতি বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীরাও দেহের বিভিন্ন জটিল জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়াতে ভিটামিন সি-র কার্যকারিতা খুঁজে পাচ্ছেন। তাছাড়া ক্যাটেকোলামিন (catecholamine), এল-কারনিটিন (L-carnitine), কোলেস্টেরল (cholesterol), বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড এবং পেপটাইড গঠিত কিছু হরমোন (peptide hormones) সংশ্লেষে গুরুত্বপূর্ণ কো-ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করে ভিটামিন সি।

একটি মাঝারি সাইজের কমলালেবু থেকে প্রায় ৭০ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা মোটামুটিভাবে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদার সমান। তবে গবেষকগণ একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় ষাট মিলিগ্রাম করে ভিটামিন সি থাকার কথা সুপারিশ করলেও এ নিয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। তাছাড়া দেশ-কাল ভেদে এই অত্যাবশ্যকীয় পদার্থটির RDA (Recommended Daily Allowance)-এর পরিমাণও পাল্টে যায়। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লাইনাস পাউলিং জীবনের শেষ পর্যায়ে ভিটামিন সি নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেছিলেন। ১৯৭০-এর দশকে এই নিয়ে বেশ কতগুলি গবেষণাপত্রও লিখেছিলেন এই প্রবাদপ্রতিম রসায়নবিদ। তাঁর সুপারিশ অনুযায়ী ওষুধ হিসাবে হাই ডোজ অ্যাসকরবিক অ্যাসিড গ্রহণ করলে জ্বর-ঠাণ্ডা লাগা ও ক্যান্সারের মত অসুখকেও প্রতিহত করা সম্ভব। তবে সমসাময়িক চিকিৎসাশাস্ত্র পাউলিং-এর এই তত্ত্বকে মান্যতা দেয়নি। যদিও বার্ধক্য বা অন্যান্য অসুস্থতা এবং অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি মাত্রায় ভিটামিন সি গ্রহণের পরামর্শ ডাক্তারবাবুরা দিয়ে থাকেন। সাধারণভাবে দৈনিক ১৫০ মিলিগ্রাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড গ্রহণকে স্যাচুরেশন লেভেল হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত ভিটামিন সি কোনো কাজে না আসায় জলে দ্রবীভূত অবস্থায় মূত্রের সাথে দেহ থেকে নির্গত হয়।

গোটা পৃথিবীতে প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার টনের বেশি ভিটামিন সি উৎপাদিত হয়। কয়েকটি সহজ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ থেকে এই বিপুল পরিমাণ ভিটামিন সি শিল্পোৎপাদন করা হয়। তবে এর বেশির ভাগটাই ব্যবহৃত হয় খাবার সংরক্ষক হিসাবে। অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ধর্ম দীর্ঘ সময় ধরে খাবারকে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন সক্রিয় মুক্তমূলক (free radical) ধ্বংস করে শরীরকে সুস্থ ও তরতাজা রাখে। DNA মিউটেশন রোধে এর কার্যকরী ভূমিকার কথা মাথায় রেখে অনেকে একে অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্ট হিসাবেও আখ্যা দিয়ে থাকেন। দেহে উৎপন্ন Reactive oxygen species (ROS) দ্রুত বিনষ্ট করে হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন সমস্যা (Cardiovascular diseases) থেকে শরীরকে মুক্ত রাখে। এমনকি স্নায়ুতন্ত্রের সঠিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভিটামিন সি। গুরুত্বপূর্ণ এই পদার্থটি আবিষ্কারের পর নয় দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত প্রাণীদেহে এর ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে জেনে ওঠা সম্ভব হয়নি।

email: acnbu13@gmail.com • M. 8967965340

আজব যত নীহারিকা ৩

ত ন্ম য় ধ র

বুমেরাং নীহারিকা (Boomerang nebula)

পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০০ আলোকবর্ষ দূরে অশ্বমানব নক্ষত্রমন্ডলে (Constellation Centaurus) রয়েছে এই বিস্ময়কর নীহারিকাটি। বুমেরাং নীহারিকা গ্রহসদৃশ নীহারিকার পূর্বাবস্থা (Protoplanetary nebula)। কেন্দ্রীয় তারকাটি এখনো অতিবেগুনি রশ্মি বিকীরণের মতো তাপমাত্রায় পৌঁছায়নি। তাই ধুলোয় প্রতিফলিত অন্যান্য তারকার আলোয় এই নীহারিকা এখন দৃশ্যমান।

কিন্তু বর্ণবৈচিত্র্য আর আকৃতির জন্য নয়, বুমেরাং নীহারিকার বিস্ময় লুকিয়ে আছে অন্য এক ক্ষেত্রে। এই নীহারিকার তাপমাত্রা মাত্র ১ কেলভিন (-২৭২.১৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) চরম শূন্যের মাত্র ১ ডিগ্রি ওপরে। আর এই জন্যই বুমেরাং নীহারিকাই হল ব্রহ্মান্ডের শীতলতম স্থান। কি করে সম্ভব হল অমন চরম শীতলতা? তার কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে বহির্মুখী গ্যাসের তীব্র প্রসারণ-বেগের জন্যই ওই নীহারিকা অত ঠান্ডা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রায় ১৬৪ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড বেগে নীহারিকাটি বহির্মুখে প্রসারিত হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মান্ডের আবহস্তরের তাপমাত্রা মাত্র ২.৭৪ কেলভিন। অর্থাৎ নক্ষত্রের নিউক্লিওসিন্থেসিস প্রক্রিয়া এবং অ্যাস্টরয়েডের সংঘর্ষ প্রক্রিয়া বাদ দিলে বিগ ব্যাং মহাবিস্ফোরণের পর থেকে ব্রহ্মান্ডের প্রসারণ এবং শীতলীভবনের ফলে ব্রহ্মান্ডের যে নিজস্ব তাপমাত্রা তা বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ২.৭৪ কেলভিনে। তার থেকেও নিম্ন তাপমাত্রায় থাকার ফলে বুমেরাং তাপীয় অস্থিরতা কি করে সামলায়, সেটা বিজ্ঞানীদের কাছে আশ্চর্যের।

email: tstorm.tanmay@gmail.com • M. 9892359674

জয়শ্রী দত্ত

হিজল

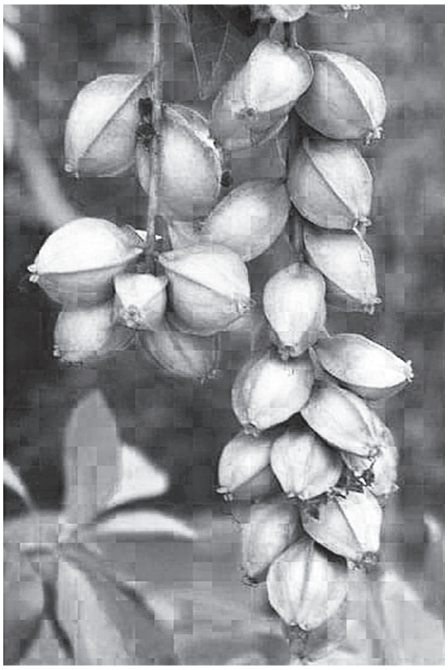

হিজল নিয়ে জীবনানন্দ, নজরুল ইসলাম থেকে শুরু করে বহু কবিই কবিতা লিখেছেন নিজের মতো করে। বাংলাদেশের হাসান মনি ছড়া লিখেছেন—"হিজল ফুলের লম্বাবেণী/দেখতে যদি চাও/গাঁ গেরামের দিঘির পাড়ে/তোমরা চলে যাও।' ছড়াকার লিখে তো দিলেন দিঘির পাড়ে গিয়ে হিজল গাছ দেখতে কিন্তু আমাদের দেশে এত সহজে হিজল গাছ আর চোখে পড়ে না। যদিও গ্রাম বাংলায় একসময় এটা খুবই পরিচিত গাছ ছিল।

হিজলের বিজ্ঞানসম্মত নাম ব্যারিঙটোনিয়া এ্যাকুটাঙুলা *(Barringtonia acutangula)*। গোত্র—লিসাইথিডেসি (Family–Lecythidaceae)। ব্যারিঙটোনিয়া নামটা হয়েছে অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ প্রকৃতিবিদ ডেইনস্ ব্যারিঙটন-এর (Daines Barrington 1727-1800) নাম অনুসারে। প্রজাতির নাম এ্যাকুটাঙুলা। এর অর্থ 'harring sharply pointed angles'। শব্দটা ল্যাটিন। ফলের পরিষ্কার নির্দিষ্ট কোণাতোলা আকৃতির জন্যই এই নাম। ইংরেজিতে একে 'ইন্ডিয়ান ওক' বলে।

জলের ধারে, বাদা অঞ্চলে গাছটা ভাল হলেও এরা খরা বা বন্যা দুটোই সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। কয়েক মাস ধরে বন্যার জলে ডুবে থাকলেও গাছটা টিকে থাকতে পারে।

দক্ষিণ এশিয়া, ফিলিপিন্স, কুইন্সল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলই হিজলের আদি বাসস্থান।

সাধারণ অবস্থায় এরা চিরসবুজ গাছ, তবে খরার সময়ে বাষ্পমোচন কমানোর জন্যে অনেক সময় এদের পাতা ঝরে যায়।

গাছটা ৫ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। গাছের ঘন ধূসর বাকলে লম্বা চেরা দাগ থাকে। পাতাগুলো ২০ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা বিডিম্বাকার (obovate)। সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। গাছের ডাল থেকে ঝুলে পরা ৫০ সেমি লম্বা পুষ্পদণ্ডে অসংখ্য লাল রঙের ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফুলগুলো পাউডার পাফের মতো, অসংখ্য সরু সুতোর মতো পুংকেশর ফুল জুড়ে থাকে। সূর্যাস্তের পর ফুল ফোটে, আর সূর্যোদয়ের পর ঝরে যায়। ফুলে হাল্কা সুগন্ধ থাকে।

ফলগুলো চারকোণা ক্যাপসুল জাতীয়, ৩ থেকে ৪ সেমি লম্বা, ভেতরটা স্পঞ্জের মতো। ফল পেকে জলে ভেসে গেলেও যেখানে মাটি পায় সেখানেই নতুন গাছ জন্মাতে পারে সহজেই। ফলে একটা বীজ থাকে।

ফুলের মধু আকর্ষণ করে চামচিকে, মথ, লোরিকিটের মতো মধুপায়ীদের।

হিজলের কচি পাতা সব্জি হিসাবে খাওয়া হয়।

ঔষধী হিসাবে হিজলের ব্যবহার অতি প্রাচীন। পাতার রস তেলের সাথে মিশিয়ে ঘরোয়া চিকিৎসায় ফোঁড়ার ওপর লাগান হয়। হিজলের শিকড়ের স্বাদ তিতো।

গবেষণা করে এর বীজের রস থেকে টিউমার প্রতিষেধক, এ্যান্টিবায়োটিক, ছত্রাক প্রতিষেধক গুণ প্রমাণিত হয়েছে।

এর ছাল ব্যথা কমানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে হিজলের ছাল থেকে গ্যালিক অ্যাসিড, bartogenic acid, স্টিগমাস্টেরল, ট্রাইটারপিনয়েড্স ও আরো বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক যৌগ নিষ্কাশন করা হয়েছে।

যদি কেউ গাছটা না দেখে থাকো তবে শিবপুর উদ্ভিদ উদ্যানে গিয়ে গাছটা দেখে আসতে পারো।

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাসের কবিতায় হিজল আসে ফিরে ফিরে। রূপসী বাংলায় কবিতার ছত্রে লিখেছিলেন—"জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশ্বত্থের করে আছে চুপ..... এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ।" এই অপরূপ রূপ অনুভব করতে হলে হিজলকে তো দেখতেই হবে, আলাদা করে।

email:joyashree.datta@yahoo.co.in • M. 9831060548

পল্লব রায়গুপ্ত

ঢেউয়ের তালে, ভুবন দোলে

স্যার আইজাক নিউটনের বাড়ি, উলসথ্রপ

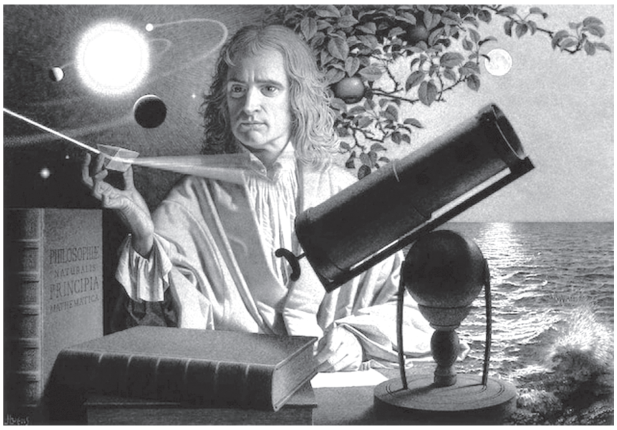

স্যার আইজাক নিউটন

লক ডাউন এবং নিউটন

যে সময়ে এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি সেই সময় বিশ্ব জুড়ে এক মারণ রোগ থাবা বসিয়েছে। করোনা ভাইরাস, যার পোষাকী নাম COVID 19 সারা বিশ্বে কেড়ে নিয়েছে বহু প্রাণ। ভাইরাস-এর আক্রমণ রুখতে সর্বত্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক এরকমই এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল ২০০ বছর আগে, যখন সারা বিশ্ব জুড়ে প্লেগ রোগ ছেয়ে গিয়েছিল, শয়ে শয়ে মারা যাচ্ছিল আক্রান্ত মানুষ। আর স্কুল, কলেজ বন্ধ করে সব ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতে বলা হয়েছিল। সালটা ছিল ১৬৬৫, আইজ্যাক নিউটন তখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তিনি ফিরে এলেন নিজের গ্রামের বাড়ি উলসথ্রপ-এ।

অবসর সময় কাটাতে নিউটন সাহেব ভাবতে বসলেন মহাবিশ্বের রহস্য নিয়ে। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ বড় বেশি আকর্ষণ অনুভব করে রাত্রের আকাশে। অসংখ্য ফুটকি ফুটকি আলো ছড়ানো নক্ষত্ররাজি কোন মন্ত্রবলে আটকে আছে একে অপরের সাথে? যে চাঁদের আলোতে রাতের সব অন্ধকার ছাপিয়ে জ্যোৎস্নার জোয়ার আসে পৃথিবীতে, সেই চাঁদই বা কিভাবে পৃথিবীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলেছে? এরকমই বিবিধ প্রশ্ন নিউটনকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল সারা দিনভর। নিজের বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও গণিতের সাহায্যে নিউটন বললেন এই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু প্রত্যেকটি বস্তুকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তিনি আকর্ষণ বলের নাম দিলেন মহাকর্ষ (Gravitation), এই বলের প্রভাবেই মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু এত সুন্দর ছন্দে একে অপরের সাথে রয়েছে আর ঐ একই বলের জন্য গাছের আপেল মাটিতে এসে পড়েছে। তিনি গণিতের সাহায্যে খুব সহজ ভাবে দেখিয়ে দিলেন এই বল কিভাবে কাজ করে। তিনি দেখলেন এই মহাকর্ষীয় বল বস্তুদুটির ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ ভারী বস্তুর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল বেশি জোরদার। আর এও বললেন এই বল বস্তুদুটির মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক অর্থাৎ দুটি বস্তুর মধ্যেকার দূরত্ব কমলে তাদের মধ্যে টানও বাড়বে হুহু করে। আবার তাদের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়ে গেলে আকর্ষণ বলও ক্ষীণ দুর্বল হয়ে পড়বে। এই বলের মহিমা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিউটন সাহেব তাঁর লেখা বই প্রিন্সিপিয়াতে বললেন যে মহাকর্ষ বল কিভাবে কাজ করে সেটা আমি বুঝতে পেরেছি কিন্তু কেন দুটি বস্তুর মধ্যে এই বল কাজ করে সেটা আমার জানা নেই এবং সুচারু ভঙ্গিমায় নিউটন সাহেব এই ঘটনার অতিপ্রাকৃত কোনো শক্তির হাত আছে বলে ব্যাখ্যার ইতি টানেন। যদিও সত্য তখন ছিল সুদূর পরাহত। নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী মহাকর্ষীয় বল একটি তাৎক্ষণিক বল। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে দূরত্ব যাই হোক না কেন তারা একে অপরকে আকর্ষণ করবে কোনো সময় ব্যয় না করেই। এখানেই লাগল খটকা। আমাদের মহাবিশ্বের আকার তো নেহাত মন্দ নয়, যদি বস্তু দুটি মহাবিশ্বের দুপ্রান্তে অবস্থান করে তাহলেও কি তাদের মধ্যেকার আকর্ষণ বল তাৎক্ষণিক হবে? অর্থাৎ কোনো একটি বস্তুর অবস্থান পরিবর্তন করলে তৎক্ষণাৎ কি সেই প্রভাব অন্য বস্তুটির ওপর পড়বে?

স্থান-কালের মোচড়

আইজ্যাক নিউটনের দেওয়া এই মহাকর্ষ বলের রহস্যাবৃত অংশ উন্মোচিত হতে সময় লেগে গেল দুশো বছরের বেশি। আসরে নামলেন ইহুদি জার্মান যুবক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। তিনি ততদিনে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বের (special theory of relativity) আবিষ্কারক হিসেবে বিজ্ঞানী মহলে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই ছন্দময় মহাবিশ্ব যে সুতোর টানে জুড়ে আছে, নিউটন তার বহিরঙ্গের রূপ বর্ণনা করেছেন মাত্র, তার স্বরূপ সন্ধান করা হয়ে ওঠেনি। আর তাই আসরে নামলেন আইনস্টাইন। প্রথমেই তিনি স্থান (space) এবং কাল (time) এই দুটি বিষয়ের ধারণা আমূল ভাবে বদলে দিলেন। তিনি বললেন স্থান ও কাল একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। তাই তারা আলাদা দুটি উপাদান নয়। সময় এমনিতেই বড় রহস্যময় জিনিস। নিউটন সাহেব সময়কে সহজ ভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, বলেছিলেন স্থান বা দেশ (space) ও সময় (time) দুটি ভিন্ন রাশি। আইনস্টাইন তা মানলেন না। তিনি বললেন স্থান ও কাল একই বিষয়, তারা একে অপরের আলাদা নয়। তিনি যা বললেন সেটি একটা উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যাক। ধরা যাক এক ব্যক্তি পৃথিবীর উপর একটি ওজন যন্ত্রে দাঁড়িয়ে নিজের ওজন নিচ্ছে। ওজন যন্ত্রে যে সংখ্যাটি দেখায় সেটি হলো পৃথিবী যে পরিমাণ

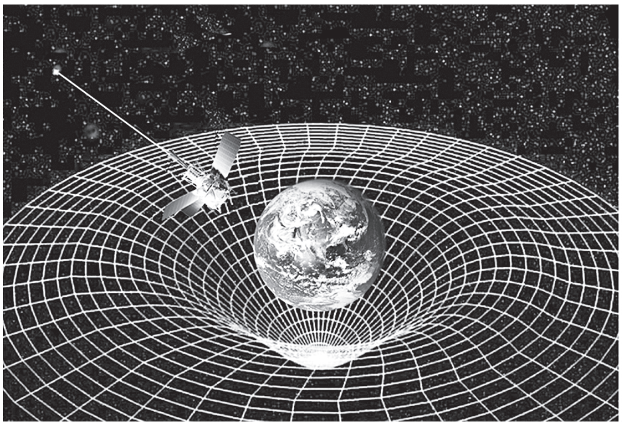

মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র

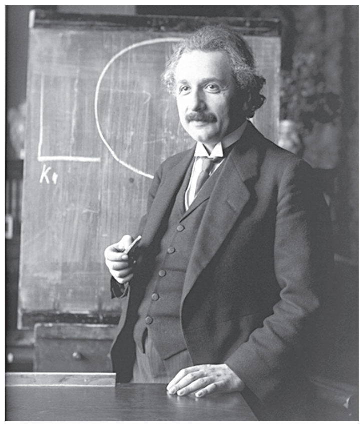

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

বলে ব্যক্তিটিকে নীচের দিকে টানছে বা ব্যক্তিটি নিজের ওজনের জন্য যে পরিমাণ বল যন্ত্রটির উপর প্রয়োগ করছে। এখন ব্যক্তিটি যদি হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ ওজন যন্ত্রের কাঁটা ঘুরে গিয়ে শূন্যে নেমে যাবে এবং ব্যক্তিটি যখন নিচের দিকে নামবে তার নিজের ওজন শূন্য মনে হবে। এখন ভাবা যাক ব্যক্তিটি একটি রকেট-এ চেপে মহাশূন্যে পাড়ি দিচ্ছে। রকেটটির ত্বরণ (Acceleration) যদি ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^{২} হয় তাহলেও লোকটির ওজন পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে নেওয়া ব্যক্তিটির ওজনের সমান হবে। এক্ষেত্রে রকেটের মেঝে ওই পরিমাণ বল দিয়ে ব্যক্তিটিকে উপরের দিকে ঠেলছে তাই ওজন যন্ত্রে ব্যক্তিটির ওজন অপরিবর্তিত থাকবে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আমরা তাহলে কি করে বুঝব যে আমি মহাকাশে নাকি পৃথিবীর মাটিতে আছি? না আমরা সত্যিই বুঝতে পারব না। আইনস্টাইন বললেন অবাধে পতন আর শূন্য মহাকাশে বিচরণ করার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুটোর ক্ষেত্রেই বস্তুটি ওজন শূন্য।

ওজন শূন্যতা

আর একটু সহজ ভাষায় বললে অবাধে পতনশীল কোনো বস্তু কোনোও মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল অনুভব করে না তার কারণ সত্যিই কোনো বল বস্তুটিকে নীচের দিকে টানছে না। আইনস্টাইনের এই তত্ত্বটি ইকুইভ্যালেন্স প্রিন্সিপাল অর্থাৎ স্থানের সমসত্বতা তত্ত্ব নামে পরিচিত। মহাকর্ষ শুধুমাত্র স্থান-কাল বা স্পেস-টাইম-এর বক্রতা মাত্র। এবার দেখে নেওয়া যাক মহাকর্ষ কিভাবে সময়ের উপর ছড়ি ঘোরায়। স্থান-কাল একটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র। কল্পনার সুবিধার জন্য আমরা এটিকে দুটি আলাদা সুতোয় বোনা একটি কাপড়ের টুকরো ভাবতে পারি। পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় যার পোশাকি নাম স্পেস-টাইম ফেব্রিক। এবার কল্পনা করতে চেষ্টা করো ওই কাপড়টিকে টানটান করে ধরা হল এবং তার উপর একটি ভারী লোহার বল রেখে দেওয়া হল। তাহলে আমরা দেখব বলটির ওজনের জন্য কাপড়টি নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। অর্থাৎ বস্তুটি নিজের ভরের জন্য নিজের আশেপাশের স্থানকে দুমড়ে মুচড়ে দিয়েছে। ঠিক এমনটাই ঘটে গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্ষেত্রে। গ্রহ বা নক্ষত্র তাদের ভরের জন্য নিজের চারপাশের স্থান-কালের বুনোটকে একদম বাঁকিয়ে ফেলে। এই স্থান-কালের বক্রতা বা স্পেস-টাইম কার্ভেচারকেই (curvature) আমরা মহাকর্ষীয় বল ভাবি। সুতরাং ব্যাপার তাহলে দাঁড়াল যে মহাকর্ষ কোনো বল নয় এটা শুধুই একটি জ্যামিতিক বক্রতা। এই বক্রতার পরিমাপই ঠিক করে দেয় কোনো বস্তুর মহাকর্ষ কত বেশি আর এটার সহজ উত্তর হচ্ছে যে বস্তুর ভর যত বেশি সেই বস্তু তত বেশি তার আশপাশের স্থানকে বাঁকিয়ে ফেলে আর তাই যত ভারী বস্তু তার মহাকর্ষের পরিমাপও তত বেশি।

সময় জব্দ, ঘড়ি স্তব্ধ

আচ্ছা বলছি তো বটে স্পেস ও টাইম যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাদের আলাদা করা যায় না তার প্রমাণ কি? আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী ভারী বস্তুর অবস্থানের জন্য যদি স্পেস দুমড়ে মুচড়ে যায় তাহলে তো সময়েরও নিষ্কৃতি নাই, সময়ও বিকৃত হবে। বাস্তবে ঘটেও ঠিক তাই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মহাকাশে রাখা কোনো ঘড়ির তুলনায় পৃথিবীর মাটিতে রাখা কোনো ঘড়ির কাঁটার গতি কিছুটা হলেও শ্লথ যায়। অর্থাৎ মহাকর্ষের উৎসস্থলের যত কাছে যাওয়া যায় ঘড়ির কাঁটার গতি তত কমে। আর তাই পৃথিবীর মাটিতে রাখা ঘড়িটি স্লো

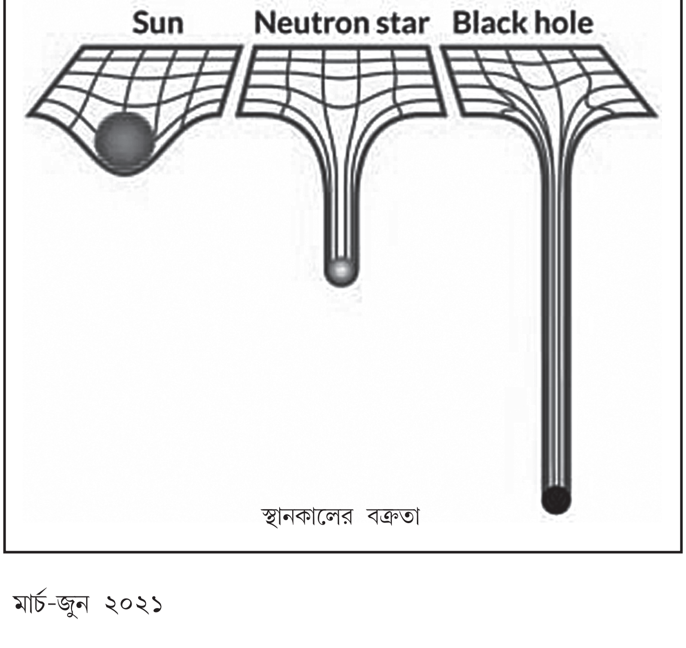

স্থানকালের বক্রতা

চলে। তাহলেই বোঝো মহাকর্ষ কিভাবে সময়কেও জব্দ করতে পারে। স্বভাবতই মনের মধ্যে আর একটা প্রশ্ন উঁকি দেয় তাহলে কি এমন কোনো স্থান আছে যেখানে গেলে ঘড়ির কাঁটা একদম স্থির হয়ে যাবে?

"ভাবো, ভাবো, ভাবা প্র্যাকটিস করো।" যে বস্তুর ভর যত বেশি সে তার আশপাশের ক্ষেত্রকে বেশি বাঁকিয়ে ফেলে। এই মহাবিশ্বে ব্ল্যাকহোল হল একটি বস্তু যার ঘনত্ব অসীম আর তাই তার ভরও হয়ে যায় কল্পনাতীত। ব্ল্যাকহোলে তার আশপাশের ক্ষেত্রকে এতটাই বাঁকিয়ে ফেলে যে আলোও সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পায় না। এহেন ব্ল্যাকহোলের আশেপাশে থাকা কোনো ঘড়ির কাঁটার যে কি দশা হবে তা সহজেই অনুমেয়। ঘড়ির কাঁটাও যাবে স্তব্ধ হয়ে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি ব্ল্যাকহোলে পড়ে গেলে তার জন্য সময় কিন্তু স্থির থাকবে। ভাবতে যতই অবাক লাগুক না কেন এটাই সত্যি।

ওই আঁকা বাঁকা পথটি ধরে

এবার আর একটু কল্পনা করে দেখ ঐ বেঁকে যাওয়া রবারের চাদরের উপর যাচ্ছি আর একটি ছোট বলকে গড়িয়ে দিই তাহলে বলটি ঐ ভারী বলটিকে কেন্দ্র করে গোল করে ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মধ্যেখানে পড়ে যাবে। এই ঘটনা থেকে আমরা এটা উপলব্ধি করতে পারছি যে ছোট বলটির চলার পথটাই বেঁকে যাওয়ার কারণে বলটিকেও ঐ বাঁকাক্ষেত্রে ঘুরতে হয়েছে। এছাড়া

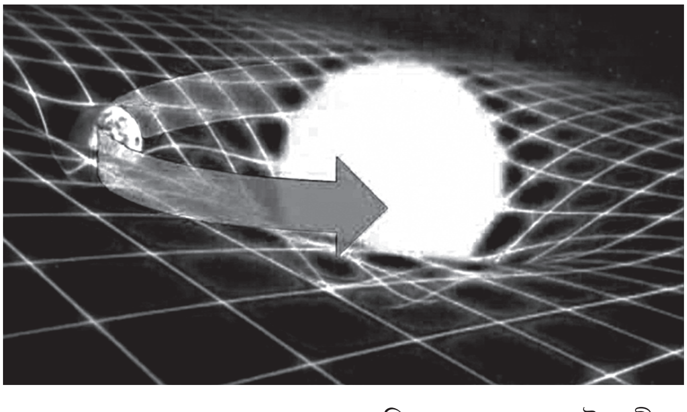

তার কাছে অন্য কোন রাস্তা খোলা ছিল না। তাহলে এই পরীক্ষা থেকে সহজভাবে অনুমান করা যায় সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলি এরকম ঘুরপাক খায় কেন। তার কারণ গ্রহগুলি চলার পথটাই সূর্যের ভরের জন্যে বেঁকে গেছে। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বটিকে সহজ করে বলতে গিয়ে আর এক বিদগ্ধ বিজ্ঞানী ও সুবক্তা জন হুইলার বলেন "কোন বস্তুর ভর তার আশেপাশের ক্ষেত্রকে বলে দেয় কতটা বাঁকতে হবে আর ক্ষেত্র বলে দেয় বস্তুকে বল কোন পথে চলতে হবে।"

১৯১৬ সালে প্রকাশিত হল, মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের চমকপ্রদ আবিষ্কার যা মহাকর্ষ সম্পর্কে এতদিনের ধ্যানধারণাকে নিমেষে নস্যাৎ করে দিল। সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহলে এক আলোড়নের সৃষ্টি হল। এত আর যে সে ব্যাপার নয়, এ একেবারে বিজ্ঞানের একচ্ছত্র সম্রাটের সঙ্গে দ্বৈরথ। তাই সহজেই অনুমান করা যায় যে আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি বিজ্ঞানী মহল খুব সহজে স্বীকৃতি দেয়নি।

প্রথম স্বীকৃতি এসেছিল ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটনের হাত ধরে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটার মাঝে এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উঠেপড়ে লেগেছিলেন একজন জার্মান বিজ্ঞানীর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে সে এক মহাকাব্যের সমান। আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনো ভারী নক্ষত্রের ভরের কারণে তার আশপাশের ক্ষেত্র এতটাই বেঁকে যায় যে আলো আর সোজা পথে আসতে পারে না, অনুসরণ করতে হয় বাঁকা পথ। আর তাই সূর্যের পাশ দিয়ে কোনো আলো আসার সময় বেঁকে যায়।

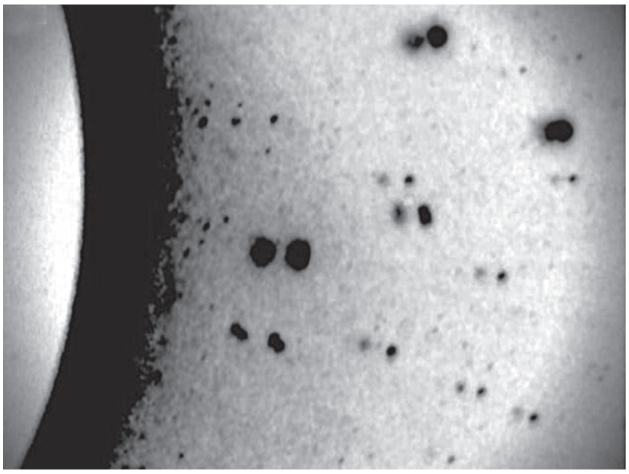

এডিংটনের তোলা ছবি যা থেকে রিলেটিভিটির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল

স্যার আর্থার এডিংটন

এই বক্তব্যের সত্যতা বিচারের জন্যেই আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন। ১৯১৯ সালে ২৯ মে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় নক্ষত্রের স্থান পরিবর্তনের ছবি তুলে প্রমাণ করলেন সত্যি সত্যি সূর্যের পাশ দিয়ে আসার সময় আলোর গতিপথ বেঁকে যায়। স্বীকৃতি পেল আইনস্টাইনের তত্ত্ব, বিজ্ঞান এগিয়ে চলল নিজের গতিতে।

ওই মহাসিন্ধুর ওপর থেকে...

আজ কিন্তু অন্য আরেকটি পরীক্ষার গল্প করতে বসেছি তোমাদের সাথে যা আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির তত্ত্বকে সরাসরি প্রমাণ করে। এই প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছিলাম স্পেস হল পাতলা একটা চাদর বা কাপড়ের মতো। কোনো ভারী বস্তুর জন্য যেমন বেঁকে যায় ঠিক তেমনই মহাবিশ্বের যেকোনো দুটি ভারী বস্তু যদি নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় তাহলে তা স্পেসকে আন্দোলিত করে। পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়ে তা সারা পুকুরে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক তেমনই মহাজাগতিক কোনো সংঘর্ষ বা কোনো নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে স্পেসে ওই একই রকম তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই মহাজাগতিক তরঙ্গের নাম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বা গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ। কি অভূতপূর্ব একটা ব্যাপার ভেবে দেখতো মহাবিশ্বের কোনো সুদূর প্রান্তের কোনো খবর ছড়িয়ে পড়ছে তরঙ্গের আকারে।

ঠিক যেন মহাবিশ্বের মহাসংগীতের সুর ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে বিপুল লহরী তুলে। তবে এখানে একটা বিষয় লক্ষ করার মতো। মাধ্যম নিজেই এখানে পোস্টম্যান অর্থাৎ মাধ্যম (স্পেস) নিজেই আন্দোলিত হয় আর ওই ঢেউ ছড়িয়ে পরে চারিদিকে আলোর গতিতে। সুদূর মহাবিশ্বের কোনো এক কোণে ব্ল্যাকহোলের মতো দুটি ভীষণ ভারী বস্তু যদি সংঘর্ষে লিপ্ত হয় কিংবা সুপারনোভা বিস্ফোরণের মতো কোনো ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে তার খবর আলোর গতিতে ছড়িয়ে পরে সমগ্র মহাবিশ্বে।

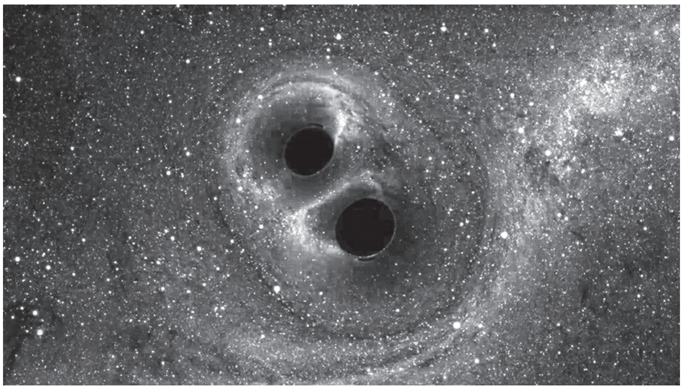

দুটি নৃত্যরত ব্ল্যাকহোল

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যখন কোনো বস্তুর ওপর দিয়ে বয়ে যায় তখন সেই বস্তুটি সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। এই সংকোচন প্রসারণ দেখেই অনুমান করা সম্ভব হয় যে বস্তুটির ওপর দিয়ে কোনো তরঙ্গ বয়ে গেল। আবার এটা অনুমান করে নিতে আমাদের কষ্ট হবে না যে স্পেস নিজেই যদি সংকুচিত ও প্রসারিত হয় তাহলে স্পেস-এ থাকা যে কোনো কিছুরই সংকোচন প্রসারণ হবে। বিজ্ঞানীরা ভাবলেন এই মহাকর্ষীয় ঢেউয়ের তালে তালে কোনো বস্তুর নাচনকে ধরতে পারলেই মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেই না ভাবা ওমনি কাজ শুরু।

ইতিহাসের পাতা উল্টে

আইনস্টাইনের কষা অংকে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ-এর উপস্থিতি যতটা সহজে এসেছিল বাস্তবে পরীক্ষাগারে তার উপস্থিতি প্রমাণ করতে বিজ্ঞানীদের সময় লেগে গেল একশো বছর। শুরুটা হয়েছিল ১৯৬০ সালে। মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত অধ্যাপক জোসেফ ওয়েবার একটি যন্ত্র বানালেন, যার নাম দিলেন ওয়েবার বার্স যা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ প্রমাণের প্রথম যন্ত্র হিসাবে ধরা হয়। আচ্ছা ওয়েবারের যন্ত্রটি কেমন ছিল তা দেখে নেওয়া যাক। ওয়েবারের তৈরি যন্ত্রটিতে ছিল দুটি দুই মিটার লম্বা ও এক মিটার ব্যাসযুক্ত দুটি এ্যালুমিনিয়াম সিলিন্ডার। ওয়েবার ধারণা করেছিলেন যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ বা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যখন এই সিলিন্ডার দুটির মধ্যে দিয়ে বয়ে যাবে তাতে অনুরণনের (Resonance) সৃষ্টি হবে। কিন্তু ওয়েবারের যন্ত্র মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি প্রমাণে ব্যর্থ হয়।

বিজ্ঞানী ওয়েবার তার যন্ত্রের সাথে

লাইগো (লেসার ইন্টারফেরোমেট্রি গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি)...

ম্যাসাচুয়েটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির বিজ্ঞানী রেইনার ওইস তার ক্লাসে ছাত্রদের পড়ানোর ফাঁকে হঠাৎই আলোর ইন্টারফেরেন্স বা ব্যাতিচারের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের যন্ত্র বানানো যায় তার একটি নক্সা বানিয়ে ফেলেন। ১৯৬৭ সালে এ বিষয়ে একটি পেপারও লিখে ফেললেন তিনি। যদিও শুরুতে সরকারি সাহায্যের অভাবে এই প্রোজেক্ট হোঁচট খায়। এরপর ১৯৯৪ সাল নাগাদ ক্যালটেক-এর বিজ্ঞানী কিপ থর্ন ও প্রফেসর ব্যারি ব্যারিশ এবং সর্বোপরি ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় শুরু হয় লাইগোর যাত্রা। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার হ্যানফোর্ড অঞ্চলে ও ১৯৯৫ সালে লস এঞ্জেলস-এর লিভিংস্টোনে স্থাপিত হল দুটি ডিটেক্টর যন্ত্র। প্রফেশর ব্যারি ব্যারিশকে এই কর্মকান্ডের প্রথম প্রধান বিজ্ঞান অন্বেষী (Principal investigator) নিযুক্ত করা হল।

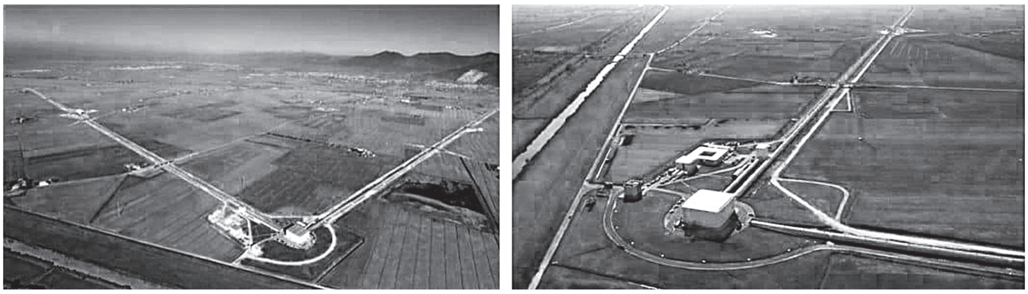

লাইগো

কিভাবে কাজ করে ইন্টারফেরোমিটার...

হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রী যারা মোটামুটি ভাবে আলোর ব্যাতিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে একটু হলেও পরিচিত তারা সহজেই এই যন্ত্রটির কর্মপদ্ধতি একটু হলেও ধরতে পারবেন। আমরা জানি কোনো একটি উৎস থেকে আলো তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি দুটি তরঙ্গ একে অপরের সঙ্গে মিশলে তরঙ্গের উপরিপাত হয়। ঠিক যেমন পুকুরের জলে পাশাপাশি দুটো ঢিল ফেললে একটা তরঙ্গ আরেকটি তরঙ্গের সাথে মিশে উপরিপাত বা ব্যতিচার ঘটে।

আমরা এটাও শিখেছি দুটি তরঙ্গ সমদশায় (same phase) একে অপরের উপর মিশলে পরিণতিস্বরূপ তরঙ্গের অ্যামপ্লিচুড বা বিস্তার বেড়ে যায় একে বলা হয় গঠনমূলক উপরিপাত (Constructive Interference)।

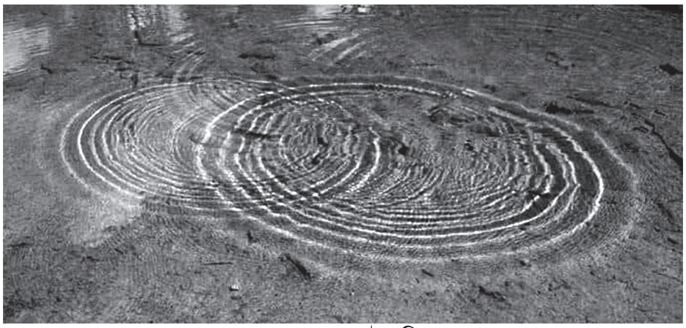

জলের তরঙ্গের উপরিপাত

এক্ষেত্রে তরঙ্গ দুটি যদি আলোর হয় তাহলে যেখানে তারা সমদশায় আপতিত হয় সেখানে আলোর তীব্রতা বেড়ে যায় আর বিপরীত দশায় (Opposite Phase) মিশলে সেখানে তীব্রতা কমে গিয়ে অন্ধকারের সৃষ্টি হয়, এই পরিস্থিতিকে বলে ধ্বংসাত্মক উপরিপাত

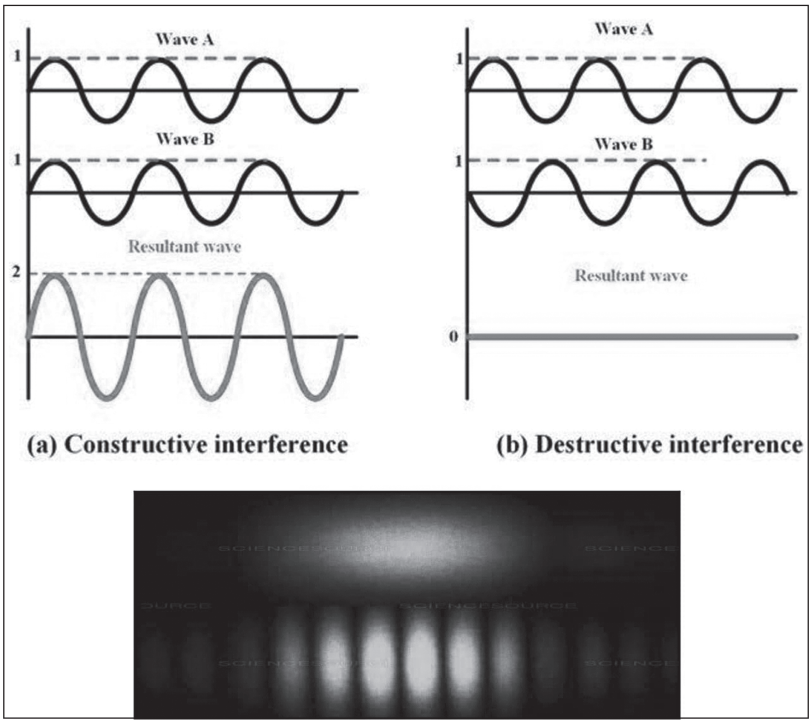

ডাবল স্লিট পরীক্ষায় আলোর উপরিপাত

(Destructive Interference)। এই পর্যন্ত আমরা মোটামুটি ভাবে জানি। এবার দেখা যাক এই যন্ত্র কিভাবে কাজ করে?

এই যন্ত্রটি ইংরেজি L-এর মতো দেখতে দুটি বাহু চার কিলোমিটার

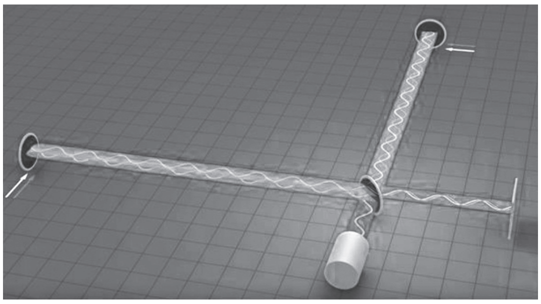

ইন্টার ফেরোমিটার কার্যপদ্ধতি

লম্বা দুটি টানেল। টানেল দুটিকে সম্পূর্ণভাবে বায়ুশূন্য রাখা হয়। টানেল দুটি যেখানে একে অপরের সাথে মিশছে, সেখানে একটি উৎস থেকে লেসার রশ্মিকে বীম স্প্লিটারের সাহায্যে সমকোণে বিভক্ত করে যন্ত্রের দুটি বাহুতে পাঠানো হয়। টানেল দুটির শেষপ্রান্তে রাখা আছে দুটি আয়না। লেসার রশ্মি আয়নাতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ও ডিটেক্টর যন্ত্রে একে অপরের সাথে বিপরীত দশায় আপতিত হয়। সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় ডিটেক্টর যন্ত্রে একটি কালো অংশের সৃষ্টি হওয়া উচিত যদিও বাস্তবিক ক্ষেত্রে যন্ত্রে ইনফ্রারেড লেসার রশ্মি ব্যবহার হয় তাই ডিটেক্টর যন্ত্রে কিছুই ধরা পড়ে না। কিন্তু ধরো কোনো কারণে যদি লেসার রশ্মির বাহুর দৈর্ঘ্যের সামান্য পরিবর্তন ঘটে তাহলে প্রতিফলিত রশ্মি দুটি আর কিন্তু একে অপরের সাথে বিপরীত দশায় মিলিত হতে পারবে না। আর তার ফলেই ডিটেক্টর যন্ত্রে সূক্ষ্ম হলেও কোনো পরিবর্তন ধরা পড়বে। কোনো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ যদি পৃথিবীর উপর দিয়ে বয়ে যায় তাহলে লেসার রশ্মির দৈর্ঘ্যেরও সংকোচন প্রসারণ হবে, আর তার ফলেই প্রতিফলিত রশ্মি দুটি আর একদম বিপরীত দশায় মিলিত হতে পারবে না। আর তার ফলেই ডিটেক্টর যন্ত্রে সূক্ষ্ম হলেও কোনো পরিবর্তন ধরা পড়বে। ফলস্বরূপ ডিটেক্টর যন্ত্রে আলোর সিগন্যাল ধরা পড়বে। আর ঠিক এভাবেই কাজ করে এই লেসার ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্রটি।

কতটা শক্তিশালী ও সংবেদনশীল এই যন্ত্র তা বুঝতে কয়েকটি পরিসংখ্যান না দিলেই নয়। এই যন্ত্রের দুটি বাহুতে যে দুটি লেসার রশ্মি চলাচল করে তাদের দৈর্ঘ্যে যদি $১০^{-১৮}$ মিটার অর্থাৎ একটি প্রোটনের আকারের ১০০০ ভাগের ১ ভাগ পরিমাণ পরিবর্তন ঘটে সঙ্গে সঙ্গে তা যন্ত্রে ধরা পড়ে যায়। শুধু তাই নয় বাইরের যে কোনোরকম কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক কারণ যেমন যানবাহনের চলাচল অথবা ভূমিকম্প ইত্যাদির ফলে তৈরি কোনো কম্পন কোনোরকম ভাবে যন্ত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। লাইগো (LIGO) অবজারভেটরি তাই সঠিক অর্থেই মানুষের তৈরি সবচেয়ে সংবেদনশীল যন্ত্র।

অবশেষে সে ধরা দিল

অবশেষে আসলো সেই দিন যার অপেক্ষায় বিজ্ঞানীরা কাটিয়ে দিলেন একশো বছর। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৫ লাইগো লিভিংস্টোনে ও হ্যানফোর্ডে ৭ মিলি সেকেন্ডের ব্যবধানে একই রকম দুটি সিগন্যাল ধরা পড়ল। দুটি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীদের কেউই প্রস্তুত ছিলেন না, এইরকম আকস্মিক এক ঘটনার জন্য। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী ভাবলেন এ বুঝি যন্ত্রের ত্রুটি কিংবা পরীক্ষার প্রয়োজনে কোনো কৃত্রিম কম্পন হয়ত প্রবেশ করানো হয়েছিল যার ফলস্বরূপ এরকম কোনো সিগন্যাল আসছে। কিন্তু সে- রকম কিছুই করা হয়নি। এইবার বিজ্ঞানী মহলে শোরগোল পরে গেল। তড়িঘড়ি তারা বসে গেল সিগন্যাল-এর উৎস সন্ধানের, যেটা পাওয়া গেল তা শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা গানকেই মনে করিয়ে দেয়—"তোমার মহাবিশ্বে কিছু, হারায় নাকো প্রভু"

১৪০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে দুটি ব্ল্যাকহোল নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, তারা একে অপরের চারপাশে পাক খেতে খেতে একসময় একে অপরের সাথে মিলে যায় আর বিপুল পরিমাণ শক্তি ছড়িয়ে পড়ে। এই ভয়ঙ্কর একটি ঘটনার খবর ভেসে আসে

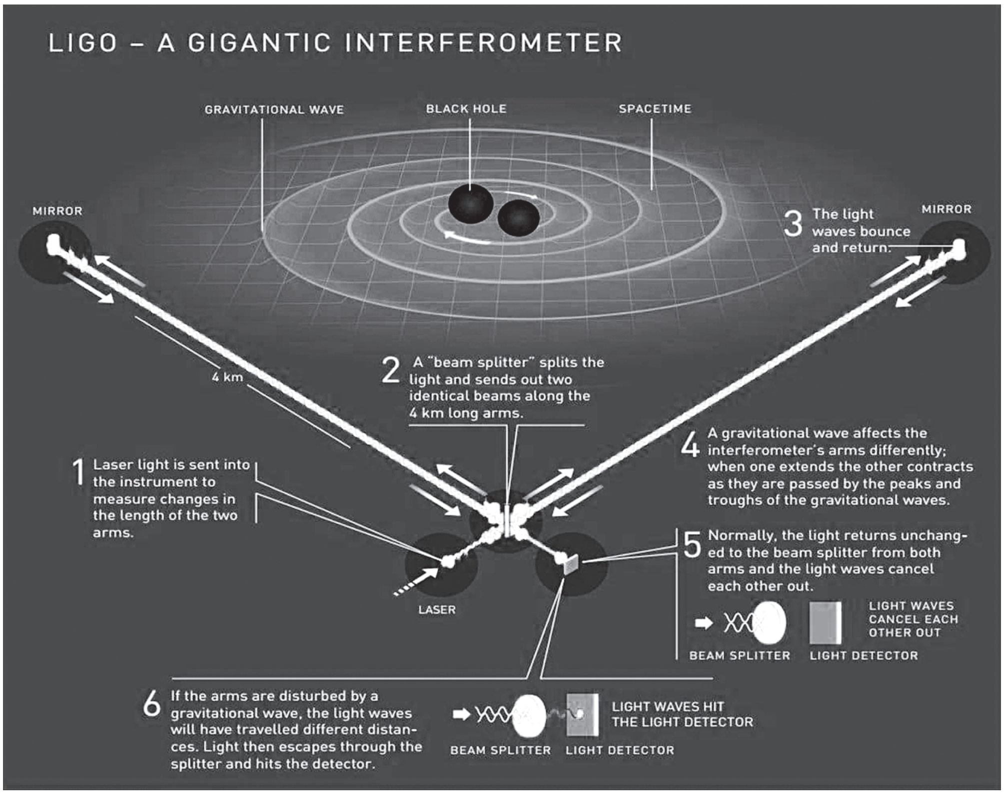

লাইগো (একটি দৈত্যাকৃতি ইন্টার ফেরোমিটার)

এপ্লিকেশনও বানানো হয়েছে, যেখানে আমরা মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আছড়ে পড়ার আওয়াজ নিজের কানে শুনতে পারব। তাহলে আর দেরি কেন, যাও শুনে নাও মহাবিশ্বের মহাসংগীত।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ওই তিন বিজ্ঞানী রেইনার ওইস, কিপ থর্ন এবং ব্যারি ব্যারিশ ২০১৬ সালে পদার্থবিদ্যার নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। আইনস্টাইনের মহাকর্ষের তত্ত্ব স্বীকৃতি পেল। যদিও একশো বছর লেগে গেল তবুও সত্য সময় সময়েই সুন্দর আর যা সত্য তা মিলতে বাধ্য। কিপ থর্ন তাঁর নোবেল লেকচার দিতে গিয়ে বললেন সমস্ত মানুষের হয়ে আমি এই পুরস্কার গ্রহণ করতে চলেছি, এ শুধু বিজ্ঞানের জয় আমি শুধুই একজন প্রতিনিধি। জয় হোক বিজ্ঞানের, জয় হোক মানুষের সত্য অনুসন্ধিৎসার।

পৃথিবীতে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের আকারে। এই তরঙ্গ পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় ১৪০ কোটি বছর।

যে দূরত্ব আমরা কল্পনাও করতে পারি না, মহাবিশ্বের কোনো সুদূর কোনো স্থান-এর খবর ছড়িয়ে পরে দিকে দিগন্তে, কোনো কিছুই হারিয়ে যায় না এই বিশ্বে। চোখ বন্ধ করে একবার ভাবতে চেষ্টা করো, অপূর্ব অনুভূতিতে মনপ্রাণ সিক্ত হয়ে যাবে। এই সিগন্যাল আমাদের আরো কিছু জানিয়ে গেল। যেমন যে দুটি ব্ল্যাকহোল একে অপরের সাথে মিশেছিল তাদের একজন সূর্যের ভরের প্রায় ৩৬ গুণ ও অপরটি প্রায় ২৯ গুণ ভর সম্পন্ন। বিজ্ঞানীরা আরো জানালেন সিগন্যালটি ০.২ সেকেন্ড স্থায়ী ছিল আর তার কম্পাঙ্ক ছিল ৩৫ থেকে ২৫০ হার্ৎজ। বিজ্ঞানীরা এই সিগন্যালকে শব্দে পরিবর্তিত করে দেখেন সেটি অনেকটা ছোট্ট পাখির কিচির মিচিরের মতো তাই তারা এই সিগন্যালটির নাম দিলেন চির্প (Chirp)।

বিশেষ উৎসাহীদের জন্য একটি Chirp নামের মোবাইল

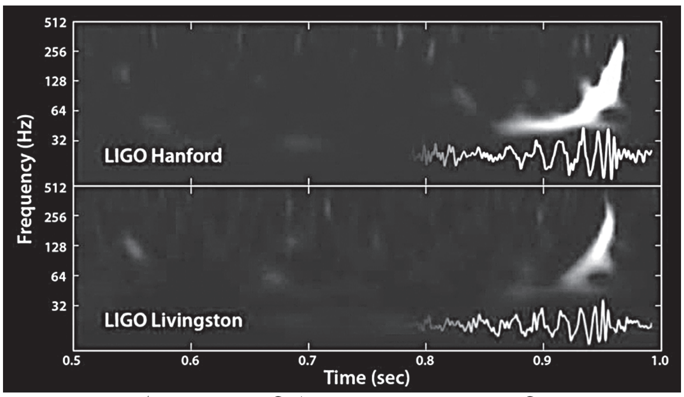

লাইগো যন্ত্রে গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ এর রেখাচিত্র

কিপ থর্ন রেইনার ওইস ব্যারি ব্যারিশ

আমরাও সামিল

মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে মহাবিশ্বকে দেখার একটি নতুন দিকের সূচনা হল। আর এই নতুন অন্বেষণকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের দেশও যোগ দিয়েছে। ভারতবর্ষে তৈরি হতে চলেছে ইন্ডিয়ান গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি বা ইন্ডিগো (IndiGO), এই অবজারভেটরির কার্যক্ষমতা আগের অবজারভেটরি-গুলির তুলনায় বেশি হবে। ভারতীয় বিজ্ঞানী মহল আমেরিকার ন্যাশনাল সাইন্স ফাউন্ডেশন-এর সহযোগিতায় মহারাষ্ট্রের হিংগোলি জেলায় শুরু করতে চলেছেন এই বিরাট কর্মযজ্ঞ। এই যন্ত্রের সংবেদনশীলতা এতটাই হবে যে লেসার রশ্মির বাহুর দৈর্ঘ্যের $১০^{-২৩}$ মিটার অর্থাৎ একটি প্রোটনের সাইজের লক্ষ ভাগের এক ভাগ পরিবর্তনও এই যন্ত্রের দ্বারা ধরা সম্ভব হবে। সুতরাং স্বপ্ন দেখা শুরু করে দাও। হয়ত এই কর্মকান্ডের হাত ধরেই আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা একদিন মহাবিশ্বের অনেক অজানা রহস্য উদঘাটন করে ফেলবেন। আর যারা এখন ছাত্রছাত্রী আছো তোমরাও তো একদিন বিজ্ঞানের মহাযজ্ঞে সামিল হতে পারবে।

email:physics.pallab@gmail.com • M. 9681021007

অ জ য় ম জু ম দা র

স্টেম-সেল আশিটির বেশি রোগ সারাবে

একই রকমের কোশ যখন নানান রূপে পরিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে, সেই কোশগুলিকেই বলে স্টেম-সেল। স্টেম-সেলের ধারণা ও আবিষ্কার কোনটাই সাম্প্রতিক কালের নয়। ২০০৭ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন মার্কিন ইভান্স, অলিভার স্মিথিজ এবং মারিও কাপেচ্চি। এই তিন বিজ্ঞানী ইঁদুর থেকে স্টেম-সেল নিষ্কাশিত করে, কাজে লাগিয়ে জিন স্থানান্তকরণের জটিল প্রক্রিয়া সুন্দর করে ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছিলেন। সেই জটিল প্রক্রিয়াটি জিনের সংযুক্তি বা বিযুক্তি দুটোই একেবারে নিখুঁতভাবে ঘটানো সম্ভব।

Mario R. Capecchi — Sir Martin J. Evans — Oliver Smithies

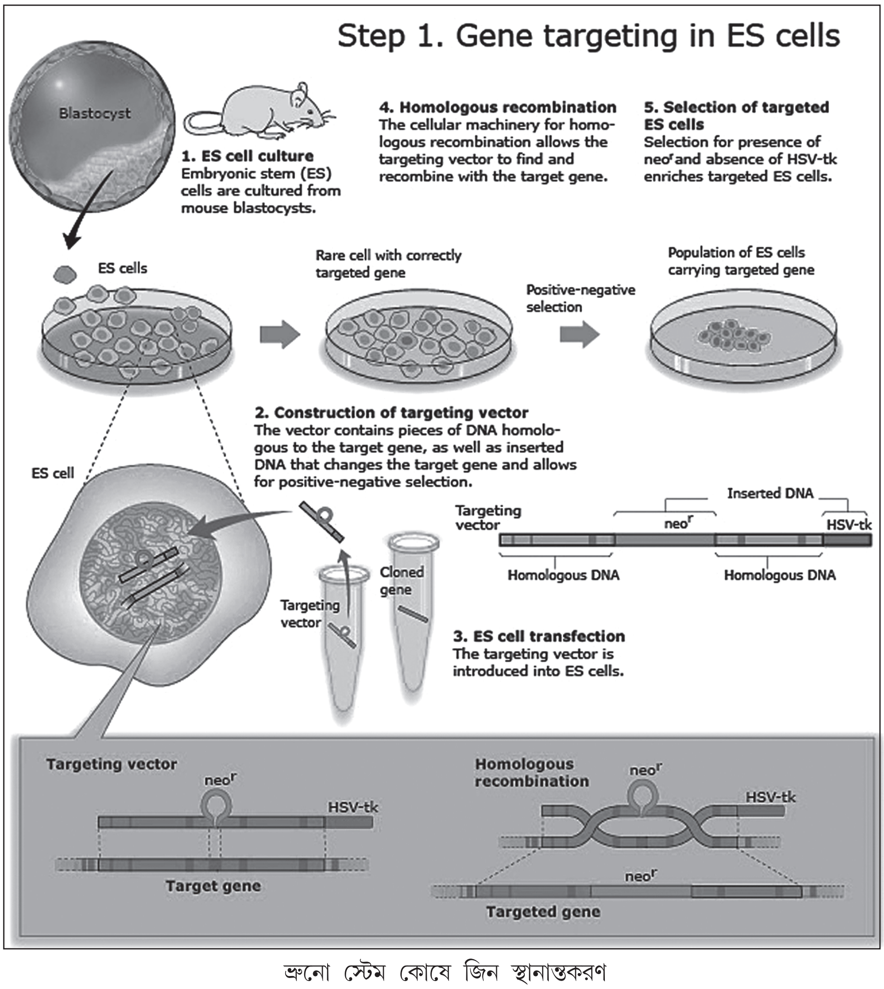

ভ্রুনো স্টেম কোষে জিন স্থানান্তকরণ

জীবনের শুরুতে থাকে একটিই কোশ। মানুষের ক্ষেত্রে মাতৃজঠরে চারদিন ধরে একটা কোশ অনবরত বিভাজিত হয়ে তৈরি করে ফেলে একগুচ্ছ কোশ। এই কোশের নাম ব্লাস্টোসিস্ট। এই কোশগুচ্ছ অনেকটা ফাঁপা ও গোলাকার। দু-মাসের মধ্যে ব্লাস্টোসিস্ট থেকে তৈরি হতে থাকে যকৃত, হৃদপিন্ড, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয় বা প্যাংক্রিয়াস, মস্তিষ্ক এবং ফুসফুস। একটি কৌশল এবং সংকেত (Signal) কিংবা রস ক্ষরণ যার প্রভাবে একপ্রকার থেকে বহু রকমের সৃষ্টি। বিশ্বের বিখ্যাত সব ল্যাবরেটরিতে এই গবেষণা নিয়ে সবাই ব্যস্ত। স্টেম-সেলের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কৌশল জানতে পারলেই কেল্লাফতে। প্রচুর পেটেন্ট তৈরি হয়ে যাবে। আসবে কোটি কোটি টাকার হাতছানি। তৈরি করা যাবে কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। ট্যাবলেট-ক্যাপসুল-ইঞ্জেকশানের সাথে তখন হয়ত ওষুধের দোকানেই বিক্রি হবে পুরো একটা যকৃত বা লিভার কিংবা হৃদপিন্ড। ভারতের রিলায়েন্স কোম্পানি স্টেম-সেল নিয়ে জোর গবেষণা চালাচ্ছে।

এই পদ্ধতিতে ক্রোমোজোমের একেবারে নির্দিষ্ট স্থানে ইচ্ছানুসারে জিনের পরিবর্তন ঘটানো যায়। কয়েক দশকের ব্যবধানে জটিল এই জিনের লক্ষ্যভেদ করার প্রযুক্তি বহু জীববিজ্ঞানী শিখে নিয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে ১লা জানুয়ারিতে জন্ম ব্রিটেনের নাগরিক মার্টিন ইভান্সের। এই বিজ্ঞানীকেই স্টেম-সেলের জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। ইতালিতে জন্ম মারিও কাপেচ্চির ১৯৩৭ সালে। তিনি জিন চিহ্নিতকরণ এবং জিন বিতাড়িত প্রক্রিয়া আবিষ্কার করে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেছিলেন। ১৯৯৪ সালে নয়াদিল্লিতে এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভায় কাপেচ্চি হক্স-জিন স্থানচ্যুতি ঘটাবার কৌশলটি উপস্থাপিত করেছিলেন।

ইয়াকোহামা-তে কৃত্রিমভাবে মানুষের অঙ্গ তৈরির কাজে বড়সড় সাফল্য মিলেছে বলে জাপানি বিজ্ঞানীরা দাবি করেন। তাঁরা স্টেম-সেল থেকে মানুষের লিভার এবং চোখের মণির এক অংশ তৈরি করার বর্ণনা দেন। জাপানের ইয়োকোহামা সিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাইকেন সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজির বিজ্ঞানীরা ইয়াকোহামায় 'ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর 'স্টেম-সেল-রিসার্চ'-এর বৈঠকে এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন। এই সাফল্যের ফলে ভবিষ্যতে কৃত্রিমভাবে কোন অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে ডোনারের প্রয়োজন হবে না। একই সাথে ওই বিজ্ঞানীরা লিভার তৈরির কথাও বলেন স্টেম-সেল থেকে।

মানুষের ক্ষেত্রে কৃত্রিম ভাবে জিনগত পরিবর্তন ঘটানো গবেষণা শুরু হয় মানুষের ত্বকের কোশ দিয়ে। এর থেকে জন্ম হয় প্লুরিপোটেন্ট স্টেম-সেল। প্রায় ন'দিন এই কোশগুলিকে রাখা হয় বিশেষ ধরনের রাসায়নিক মিশ্রণের মধ্যে। তাতে দেখা যায়, যকৃতের কোশ অর্থাৎ হেপাটোসাইট তারা তৈরি করেছে। এবার মেশানো হয় অ্যাম্বিলিক্যাল কর্ড কোশ। আর এই কোশ থেকে তৈরি হয় রক্তজালক, অস্থিমজ্জা। এই অবস্থায় আরও দুদিন থাকার পর আপনা-আপনিই ত্রিমাত্রিক পিন্ড তৈরি হয়। এটি চওড়ায় পাঁচ মিলিমিটার। বিজ্ঞানীরা এই কোশটির নাম দেন 'লিভার বাড' এটি তাঁরা ইঁদুরের দেহে প্রতিস্থাপন করেন। দেখা গেল তারা খুব সুন্দর ভাবে কাজ করে চলেছে। সাধারণ ভাবে যে ওষুধ ইঁদুর হজম করতে পারে না, ওই কৃত্রিম লিভারের সাহায্যে তাও হজম করে ফেলেছে সেটি। লিভারের কিছু অংশ নষ্ট হয়ে গেলেও নষ্ট অংশগুলিকেও মেরামত করা যাবে স্টেম কোশ দিয়ে এবং লিভারকে আগের মত স্বাস্থ্যবান করা সম্ভব হবে। রাইকেন সেন্টার ফর ডেভলপমেন্টাল বায়োলজির বিজ্ঞানীরা চোখের মণি তৈরি করেন স্টেম-সেল ব্যবহার করে। গবেষকগণ লক্ষ করেন উপযুক্ত রাসায়নিক মিশ্রণে রাখলে এই কোশগুলি নিজেরাই বিভাজিত হয়ে একটি পিন্ড তৈরি করে। যা থেকে একটি থলির ন্যায় অংশের সৃষ্টি হয়। এই থলিকে বলে অপটিক কাপ (Optic cup)। বিজ্ঞানীদের দাবি যারা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন—তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে সহজেই। খুব শীঘ্রই বাঁদরের দেহেও অপটিক কোশ প্রতিস্থাপনের চেষ্টা তারা চালাবেন।

কলকাতায় কর্ডব্লাড থেকে সংগৃহীত স্টেম-সেল সংগ্রহের একাধিক ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে বছর কয়েক আগে। শিশুর জন্মের সময়েই হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে হাজির থেকে অ্যাম্বিলিকাল কর্ড (নাড়ি) এবং প্ল্যাসেন্টা (গর্ভফুল)-এর রক্ত সংগ্রহ করেছেন ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিরা।

একটি শিশু, বয়স পাঁচ বছর নয় মাস। বাড়ি শিলিগুড়ির সেন কলোনিতে। সে ই-বিটা থ্যালাসেমিয়া রোগী। ছোট্ট শিশুর বোন অহনার জন্মের সময় কর্ডব্লাড থেকে স্টেম-সেল সংগ্রহ করা হয়েছিল। তা এখন ওই শিশুর (মৈনমের) দেহে প্রতিস্থাপন করা হবে। শিশুর বোনের দেহ থেকে বোন ম্যারো বা অস্থিমজ্জা সংগ্রহ করে সেটিও প্রতিস্থাপন করা হবে শিশুটির শরীরে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যদি সফল হয় তাহলে শিশুটি সুস্থ হবে। বিশেষজ্ঞরা সম্পূর্ণ সাফল্যের আশা করেন।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন—নবজাতকের শরীর থেকে সংগৃহীত স্টেম-সেল এই মুহূর্তে থ্যালাসেমিয়া, অ্যাপলাস্টিক অ্যানিমিয়া এবং লিউকোমিয়া রোগীদের জন্য বেশি কাজে লাগছে। ভবিষ্যতে বিভিন্ন ধরনের ক্যানসার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা, এমনকি দুর্ঘটনায় কোন অঙ্গ বাদ গেলে তা পুনর্নির্মাণও করা যেতে পারে। এটা বিজ্ঞানীদের আশা। যার স্টেম-সেল তার নিজের তো বটেই, ভাই-বোন বা পরিবারের অন্য কারো চিকিৎসাতেও তা লাগতে পারে। এসব কিছুই নির্ভর করবে জেনেটিক ম্যাচিংয়ের উপরে। স্টেম-সেল নিরাময় করতে পারে ৮০টির মত অসুখ। এতে ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা কম।

স্টেম-সেল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য খরচ মোটামুটি ৪০ হাজার টাকা। হাবড়ায় নার্সিংহোমে একটি কেস অস্ত্রোপচার করেন ডা: সাত্যকি হালদার। সেই রোগীর বাবা-মা স্টেম-সেল সংরক্ষণের জন্য উৎসাহী হন। ডা: হালদার চেন্নাই-এর সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করলে ওরা কর্ডব্লাড সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এই ব্লাড দুই জায়গায় সংরক্ষণ করা হয় বলে তাঁরা জানান—চেন্নাই ও গুরগাঁওয়ের পরীক্ষাগারে। যদি দুর্যোগে, দুর্ঘটনায় পরীক্ষাগারে নমুনা নষ্ট হয়ে যায়—সে কথা ভেবেই দু-জায়গায় আলাদা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। স্টেম-সেল গবেষণা সারা পৃথিবীতেই চলছে। এই পদ্ধতিতে আগামীদিনে মানুষের স্বাস্থ্য আরও অনেক বেশি সংরক্ষিত থাকবে—আশা করা যায়।

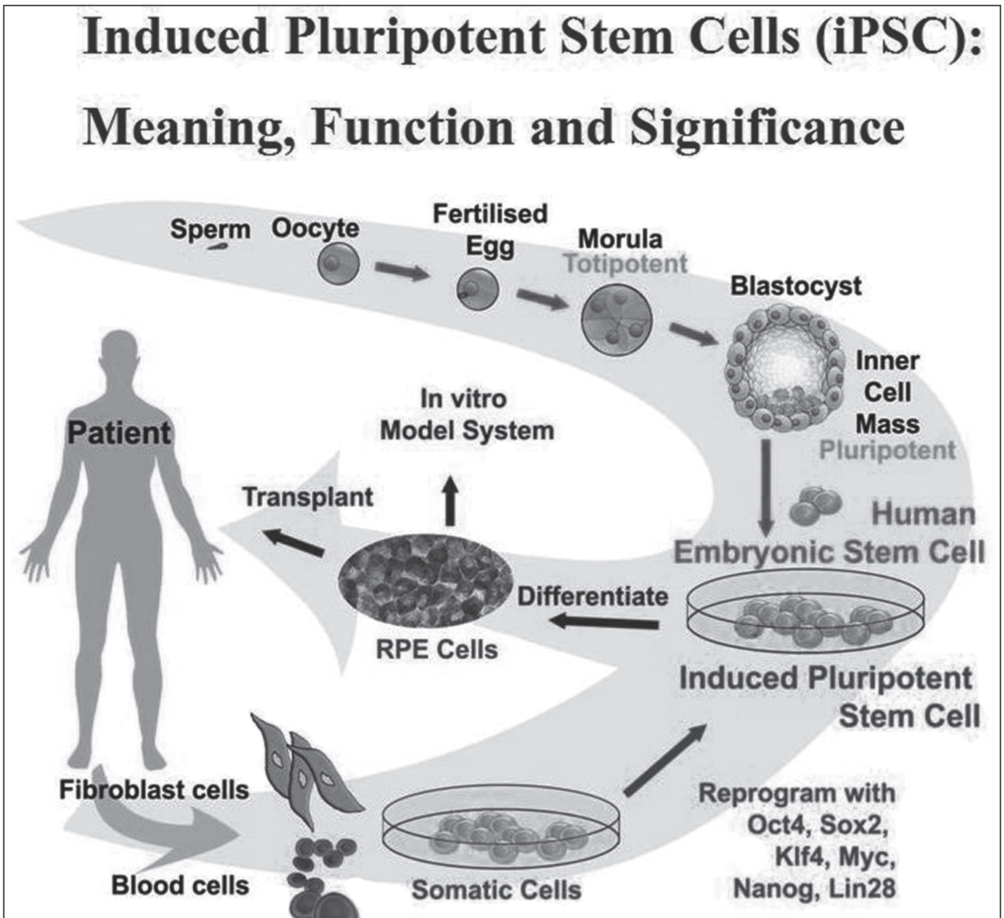

প্রণদিত প্লুরোপটেন স্টেম কোষ

email : majumderajay@gmail.com • M. 8918824281

অনিন্দ্য দে

প্রাণের খোঁজে অধ্যাবসায়, Perseverance

মার্স ২০২০ মঙ্গলযানের যাত্রা

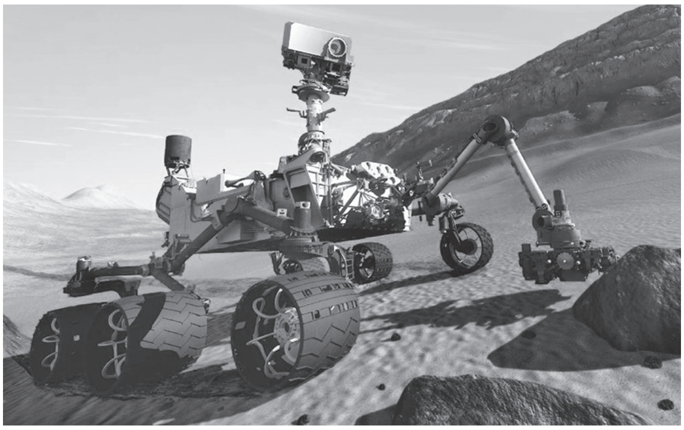

কিউরিও সিটির অবতরণ

দিনটা ছিল ৩০ জুলাই, ২০২০। সারা পৃথিবী তখন লকডাউনে স্তব্ধ। তার মধ্যেই কয়েক হাজার বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদের অক্লান্ত চেষ্টায় পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আমাদের পড়শি লাল গ্রহের দিকে ছুটতে শুরু করল নাসার মার্স ২০২০ মিশনের মঙ্গলযান। খুব যত্ন করে সাথে নিয়ে চলল পার্সিভেয়ারেন্স রোভারকে। মঙ্গলের মাটিতে ছুটে বেড়াবে এই রোভার। কিন্তু প্রশ্ন হল এর আগে মঙ্গল অভিযান তো খুব কম হয়নি; আগেও মঙ্গলের মাটিতে ঘুরে বেড়িয়েছে রোভার। তাহলে আবার কেন?

আসলে অতীতের মঙ্গল অভিযানগুলো থেকে যেসব তথ্য বা ছবি পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে সুদূর অতীতে মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব ছিল—অনেকদিন ধরেই এরকম একটা ভাবনা বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই যদি হয় তাহলে প্রাণের সম্ভাবনাটাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আর সেই উদ্দেশ্যেই আমদের সৌরজগতের এই লাল গ্রহ আদৌ প্রাণসৃষ্টির সহায়ক ছিল কিনা চেষ্টা শুরু হয়েছে সেটা খুঁজে দেখার। এই লক্ষ্য নিয়েই ২০১২ সালে কিউরিওসিটি নামের রোভারকে নামানো হয়েছিল মঙ্গলের গেল গহ্বরে। খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক কিছু রাসায়নিক উপাদানের। এমনকি, বেঁচে থাকার জন্য অণুজীবনের যে শক্তির প্রয়োজন, সেই শক্তির উৎসের খোঁজও কিউরিওসিটি পেয়েছিল। আর তাতেই অতীতকালে মঙ্গলের কোনও কোনও অঞ্চল যে প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে সহায়ক ছিল, এই ধারণাটা ধীরে ধীরে বেশ পোক্ত হচ্ছিল।

সাত মাসের মহাকাশ ভ্রমণ সেরে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি পাসিভেয়ারেন্স মঙ্গলের জেজেরো গহ্বরের মাটি ছুঁয়েছে এই ধারণাগুলোকে পরখ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই। মঙ্গলের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামী এক বছর (পৃথিবীর হিসেবে প্রায় ৬৮৭ দিন) ধরে মঙ্গলের মাটিতে ঘুরে বেড়াবে সে। সুদূর অতীতে এই জেজেরো গহ্বরের যে জায়গাগুলো প্রাণ সৃষ্টির সহায়ক ছিল বলে মনে হচ্ছে সেই জায়গাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে খোঁজ করবে আদৌ সেখানে কোনওদিন প্রাণের কোনও অস্তিত্ব ছিল কি না, খুঁজে দেখবে অতীত প্রাণের কোনও চিহ্ন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে কি না।

মঙ্গলের জলবায়ু, পৃষ্ঠদেশ ও গ্রহের অভ্যন্তরের বিবর্তন নিয়েও অনুসন্ধান চালাবে পার্সিভেয়ারেন্স। পরবর্তীকালে মঙ্গলে মানুষ পাঠাতে হলে যে সমস্ত প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হবে, যাচাই করবে সেগুলোকেও। এছাড়াও, ওর আরেকটা কাজ হল পরবর্তী সময়ে যাতে পৃথিবীতে নিয়ে আসা যায়, তার জন্য মঙ্গলের মাটি, শিলাখন্ডের নমুনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। এবারের মঙ্গল অভিযানে এই ব্যাপারটা একেবারে অভিনব। এবারে তাহলে বরং পার্সিভেয়ারেন্স মঙ্গলের মাটিতে যেসব বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকর্ম চালাবে সেগুলোকে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমে আসি ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কথায়। পার্সিভেয়ারেন্স-এর অন্যতম একটা কাজ হবে শিলা-পাথর বা ভূমিরূপ দেখে মঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাসকে খুঁজে দেখার চেষ্টা। বিজ্ঞানীদের ধারণা সুদূর অতীতে জেজেরো গহ্বরে যদি প্রাণের অস্তিত্ব থেকে থাকে তাহলে সেখানকার অতীত পরিবেশে এবং ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের মধ্যে তার কোনও না কোনও প্রমাণ থাকবেই। এই সমস্ত ভূতাত্ত্বিক রেকর্ড কীভাবে তৈরি হয়েছে বা কীভাবে তাঁদের রূপ পাল্টেছে সেটাও খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে পার্সিভেয়ারেন্স।

মার্স ২০২০ মিশনের আরেকটা লক্ষ্য হল অতীতে যে অঞ্চলে প্রাণ সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ ছিল এবং যেখানে যেখানে অতীত প্রাণের চিহ্নগুলো সংরক্ষিত আছে, সেই জায়গাগুলোকে খুঁজে বের করা। জায়গাটা উত্তপ্ত ছিল? নাকি ভেজা জায়গা ছিল সেটা? সেটা প্রাণের

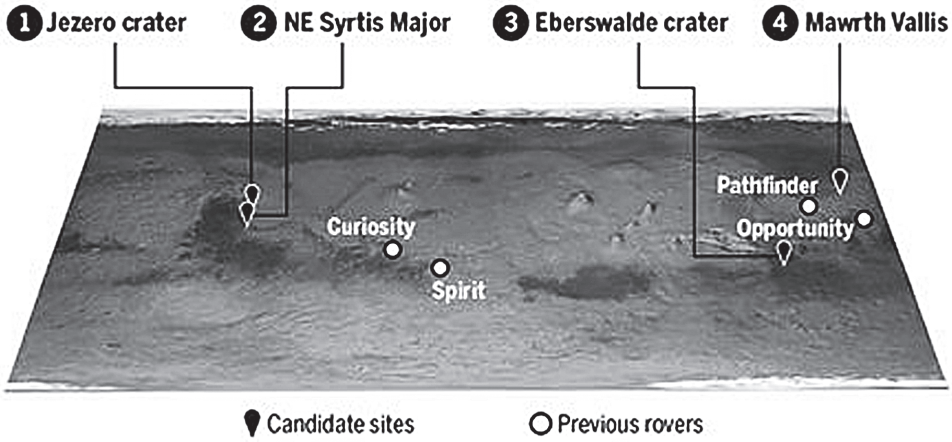

জেজেরো গহ্বর, সম্ভাব্য অনুসন্ধানস্থল, ছবিতে উপস্থিত অন্য গহ্বরগুলিও গুরুত্বপূর্ণ

সংরক্ষিত থাকারই কথা। ধারণা করা হচ্ছে অতীতের নদীবাহিত মাটি পলি জেজেরোর নদী ব-দ্বীপে এসে জমেছিল। তাই যদি হয়, তাহলে সেই মাটিতে অতীত প্রাণের সাক্ষ্য থেকে যাওয়ারই কথা। তাই জেজেরোতে ঘুরে বেরিয়ে ভূতাত্ত্বিক পদার্থে সেই সমস্ত প্রাচীন আণুবীক্ষণিক জীবের সংরক্ষিত চিহ্নের, সেটা শিলাখন্ডে প্রোথিত কোনও বিশেষ ছাপই হোক বা শিলা রসায়নের বিশেষ কোনও প্যাটার্নই হোক, অনুসন্ধান চালাবে পার্সিভেয়ারেন্স। খুঁজে দেখবে জল এবং প্রাণের রাসায়নিক মূল উপাদান- গুলো অতীতে সেখানে ছিল কি না। আমরা জানি না রোভার সেটা খুঁজে পাবে কি না। কিন্তু চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখবে না সে। আর তাই উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নিয়ে রোভার শুরু করবে তার পরের কাজ, নমুনা সংগ্রহ।

এটা এই মিশনের তিন নম্বর উদ্দেশ্য। রোভার যেখানে নেমেছে সেখানকার ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করতে পারে এমন উল্লেখযোগ্য নমুনা সংগ্রহ করে রাখা, যাতে পরবর্তী কোনও সময়ে সেই নমুনাগুলোকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা যায়। বিশেষ ভাবে তৈরি তিরিশটা নলে মঙ্গলের মাটি ও শিলাখন্ড জমিয়ে রাখবে রোভার। বিশ্ববাসীর নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার দিকটা নিশ্চিত হলে, অবশ্যই নাসা যদি মনে করে, সেইসব নমুনা পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে। কোন্ জায়গা থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছে, কোন্ ধরনের শিলা থেকে সেটা পাওয়া গেছে, কেন এটা সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই সমস্ত তথ্যসম্বলিত দলিলও তৈরি করা রাখা হবে যাতে কোনও বিজ্ঞানী গবেষণাগারে সেই নমুনা নিয়ে কাজ করার সময়ে সহজেই সেসব তথ্য পেয়ে যান।

যদি কখনও এই সংগ্রহ পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়, তাহলে সেটাই

বিকাশের পক্ষে অতিথিবৎসল ছিল কি না? এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবে এই মিশন। এটা আমরা জানি যে, জলের প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়া মাটিতে বেশ কিছু খনিজ পদার্থ আর কার্বোনেট যৌগের উপস্থিতি সম্ভব নয়। মজার ব্যাপার হল মঙ্গলকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকা মহাকাশযান থেকে অনেক আগেই মঙ্গলের মাটিতে এদের অস্তিত্ব লক্ষ করা গেছে। পৃথিবীতে সাধারণত এই কার্বোনেট যৌগগুলো তৈরি হয় জীবন্ত প্রাণী বা উদ্ভিদ থেকে। জীবনের সঙ্গে সেই সংস্রবের প্রমাণ তারা সংরক্ষণ করেও রাখে। তাই অতীতকালের জলবায়ুর রেকর্ড রাখার ক্ষেত্রেও কার্বোনেট যৌগের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে কোনও অঞ্চলের ভূমিরূপের বয়স কত সেটা বোঝা যায় আগ্নেয়গিরি থেকে নিঃসৃত শিলাখন্ড থেকে। এইসব কথা মাথায় রেখেই পার্সিভেয়ারেন্স নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের জলবায়ু ও পরিবেশের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করবে, পর্যালোচনা করবে নানান ধরনের শিলা- পাথর ও খনিজ পদার্থের ভূতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য। বোঝা যাবে অতীতে এই গহ্বর কেমন ছিল, সেখানকার আবহাওয়া কেমন ছিল, ব-দ্বীপ এবং হ্রদগুলো প্রাণের সহায়ক ছিল কি না, যদি হয় তাহলে সেটা কতদিন আগে? এই সমস্ত কারণে জেজেরো গহ্বর গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলেই মনে হয়।

পার্সিভেয়ারেন্স জ্যোতির্জীববিদ্যা সংক্রান্ত কিছু অনুসন্ধানও চালাবে। ওর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল জেজেরো গহ্বরের কোনও অঞ্চলে প্রাণের পক্ষে উপযুক্ত ছিল কি না, অতীত প্রাণের কোনও চিহ্ন সেখানে পাওয়া যাচ্ছে কি না, সেটার খোঁজ করা। সুদূর অতীতে জেজেরোর আবহমন্ডল যদি প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে অনুকূল হয়ে থাকে, তাহলে জলের চিহ্ন সেখানে

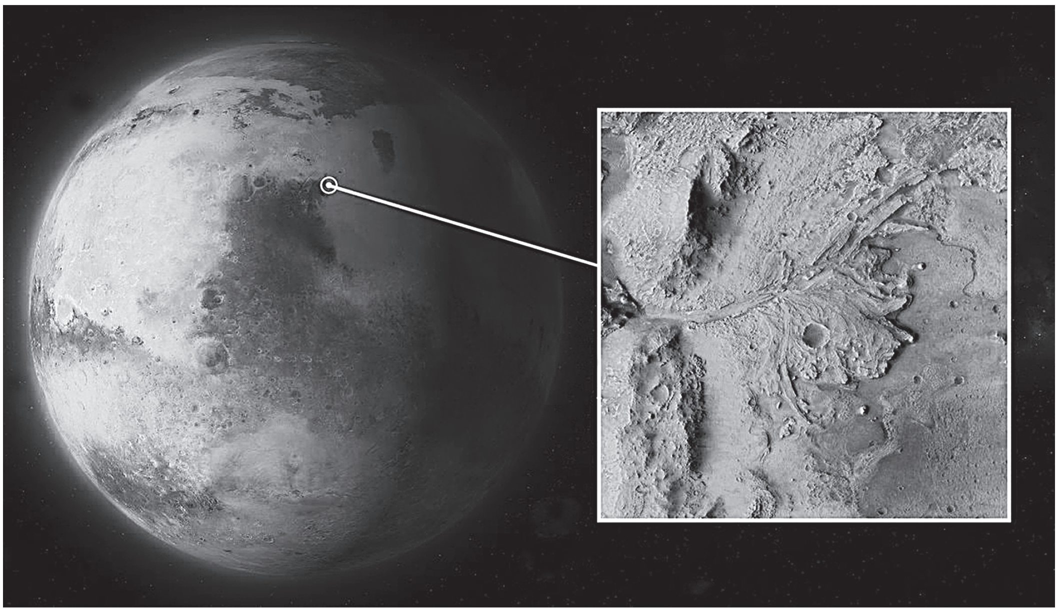

জেজেরো গহ্বর

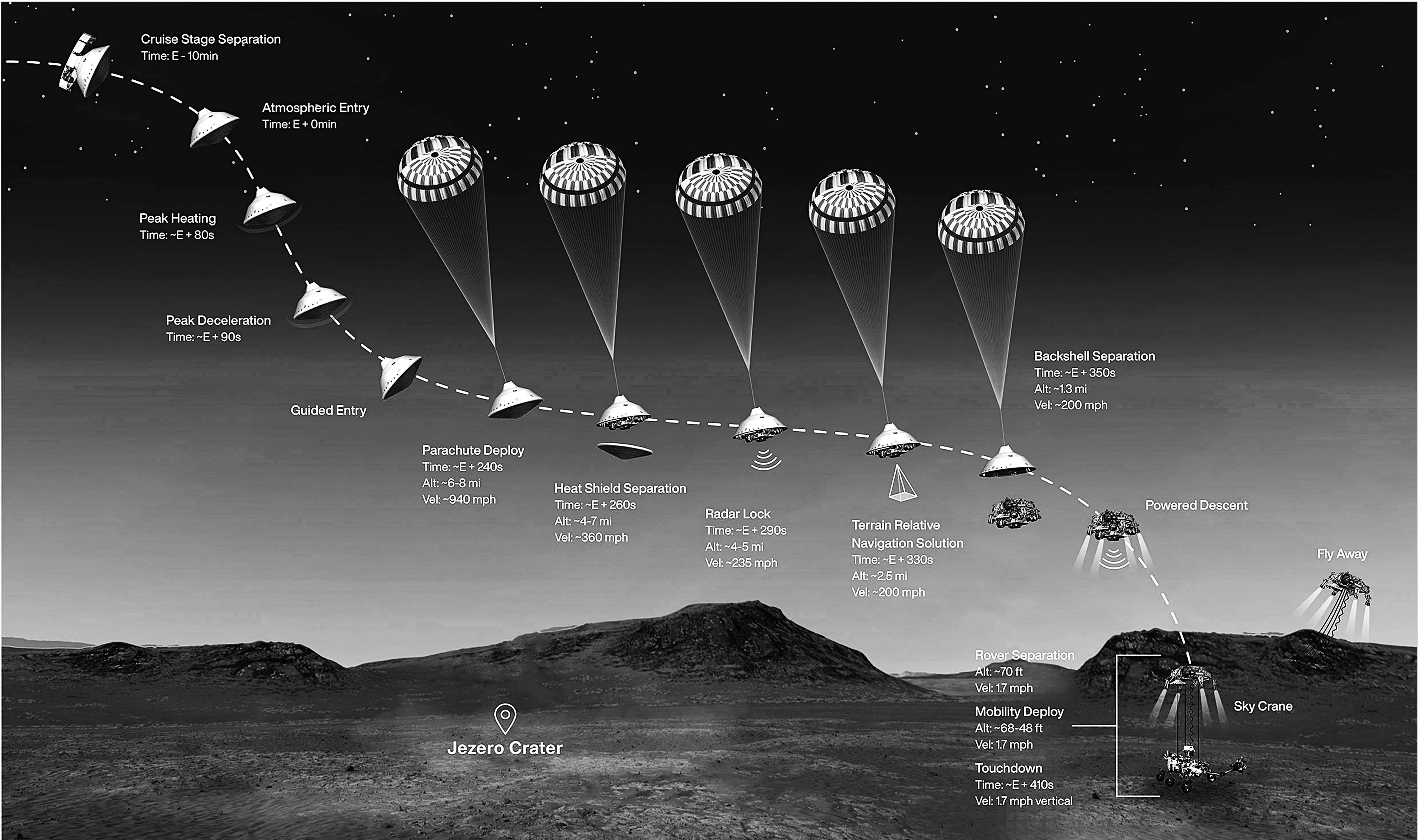

যেভাবে পার্সিভারেন্সকে মঙ্গলের মাটিতে নামানো হলো

হবে পৃথিবীর বুকে মঙ্গলের প্রথম প্রতিনিধি। তৈরি করা যাবে জেজেরোর একটা পুরোদস্তুর ছবি। নানান ধরনের নমুনার সংগ্রহ পর্যালোচনা করে কীভাবে তারা সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল সেটা বুঝে নিতে পারলেই আলোকিত হবে লাল গ্রহের আবহাওয়ার ইতিহাসের নানান অভিমুখ।

মার্স ২০২০ মিশন-এর চতুর্থ উদ্দেশ্যটা রীতিমতো অভিনব। লাল মাটিতে মানুষ পাঠানোর ব্যবস্থাপনা তৈরি। তাই পার্সিভেয়ারেন্সকে এক বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোনদিন যদি মঙ্গলে মানুষ পাঠানো হয়, সেক্ষেত্রে তার বেঁচে থাকার জন্য যেসব প্রযুক্তির প্রয়োজন তাকে সেগুলো যাচাই করে দেখতে হবে। দেখতে হবে মঙ্গলের বায়ুমন্ডল থেকে গাড়ি চালানো ও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন তৈরি করা যায় কি না। তাই রোভারের বুকে বসানো হয়েছে অভিনব প্রযুক্তির Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE)। কিছুক্ষণ পর পর টানা এক ঘন্টা ধরে অক্সিজেন তৈরি করে যাবে এই MOXIE। এক ঘন্টায় তৈরি হবে ১০ গ্রাম অক্সিজেন। কৌশলগত জ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনও যেসব জায়গায় আমাদের অজ্ঞতা আছে, সেই শূন্যস্থান পূরণের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দেখতে হবে মঙ্গলের আবহাওয়া মানুষের দেহে কীরকম প্রভাব ফেলছে। তাই মাপতে হবে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণার আকার, চিনতে হবে তার রূপ। সেই কাজটা করবে রোভারের আবহাওয়া অফিস, মঙ্গলের আবহাওয়া বিশ্লেষণ করার যন্ত্র, Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA)। হাওয়ার বেগ ও তার অভিমুখ এবং বায়ুর আর্দ্রতাও মাপবে এই MEDA।

পৃথিবীর বায়ুমন্ডল সম্পর্কে যেসব মডেল চালু আছে মঙ্গলে সেগুলো বৈধ কি না দেখতে হবে সেটাও। আর তার জন্য দরকার মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে আবহাওয়া সংক্রান্ত নানান মাপজোক। সেজন্য মঙ্গলযানের তাপরোধী বর্ম ও খোলসে বসানো হয়েছে একগুচ্ছ সেন্সর। এখানে যেসব তথ্য সংগৃহীত হবে তা থেকে আমরা জানতে পারব বাতাসের তাপীয় অবস্থা, তাপরোধী ব্যবস্থা, বায়ুমন্ডলে প্রবেশ ও অবতরণের সময়কালের গতিবিজ্ঞান-সংক্রান্ত নানান বিষয়।

প্রাণের উপযোগী আবহাওয়ার তল্লাশি করার একটা উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল জৈব পদার্থে রামন ক্রিয়া ও আলোর বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করা। তার জন্য রোভারে রাখা হয়েছে Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics & Chemicals (SHERLOC)।

যেসব জৈব যৌগ ও খনিজ পদার্থ জলীয় আবহাওয়ার কারণে ধীরে ধীরে রূপ পাল্টেছে, শার্লক তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। কিন্তু যেহেতু সে সাদা-কালো ছবি তুলবে, তাই তাকে সাহায্য করার জন্য রঙিন ছবি তোলার একটা ক্যামেরাও রাখা হয়েছে। নাম ওয়াটসন। এখানে মহাকাশযাত্রীদের পোশাকের উপকরণও পাঠানো হয়েছে মঙ্গলের রুক্ষ জলবায়ুতে সে কতটা কার্যকরী বা কতক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে সেটা দেখার জন্য।

পার্সিভেয়ারেন্স-এর মাস্তুলে (Mast), মাটি থেকে প্রায় ২ মিটার উঁচুতে বসানো আছে বেশ কয়েকটা ক্যামেরা (cam)। জুম (Z) করে মঙ্গলপৃষ্ঠ এবং বায়ুমন্ডলের নানান ঘটনার ছবি তুলবে এই Mastcam-Z।

খুব কাছ থেকে শিলা আর মাটির গঠন বিন্যাসের ছবি তোলার জন্য রাখা হয়েছে একটা এক্স-রশ্মি বর্ণালীবিশ্লেষক যন্ত্র, Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL)। অতীতকালের অণুজীবের অস্তিত্ব খোঁজার দায়িত্বটা এরই।

মঙ্গলপৃষ্ঠের নীচে ভূতাত্ত্বিক উপকরণগুলোকে দেখার জন্য কাজে লাগানো হবে RIMFAX-কে (Radar Imager for Mars' Sub-surface Experiment)। মাটির নীচে প্রায় ৩০ ফুট দূরত্ব পর্যন্ত দেখতে পায় এই যন্ত্র।

এছাড়াও আছে ২০ ফুট দূর থেকে পেন্সিলের ডগার মতো ছোট একটা বস্তুকে চিনে নিতে পারে এমন শক্তিশালী ক্যামেরা SuperCam। পুরাকালে সৃষ্ট প্রাণের সাথে সম্পৃক্ত জৈব যৌগগুলোকে খুঁজে বের করার জন্য। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি প্রাণের দ্বিতীয় আবাসভূমির খোঁজ পাওয়ার আশায়।

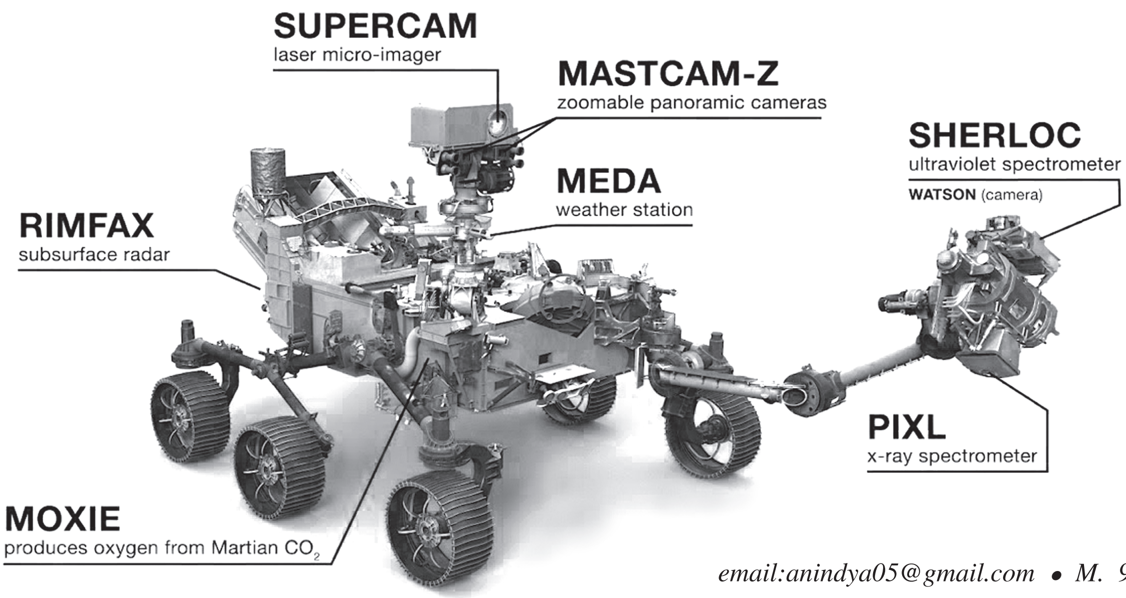

email:anindya05@gmail.com • M. 9432220412

অনিন্দিতা জোয়ারদার

যৌবনের লালিত্য বজায়ে পটু বোটক্স কি ও কেন?

রুপোলি পর্দার নায়িকাদের বলিরেখাহীন মসৃণ ত্বকের গুপ্তরহস্য কী জানেন? জানলে অবাক হবেন। তা হল ব্যাকটেরিয়ার এক মারাত্মক বিষ (টক্সিন), যার পোষাকি নাম 'বোটক্স'। অনেক নায়িকাই ত্বকের, বিশেষ করে মুখের বলিরেখা কমানোর জন্য এই 'বোটক্স' ব্যবহার করেন। এই ব্যাপারে ব্রুক শিল্ডস, ভেনিসা উইলিয়ামস্-এর মতো হলিউড তারকারা যতটা স্বচ্ছন্দে আলোচনা করেন, প্রীতি জিনটা বা বিপাশা বাসুর মতো ভারতীয় নায়িকারা করেন না। আসলে বোটক্স নিয়ে যথেষ্ট ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় ব্যাপার আছে। এই নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়, আমরা পড়িও, কিন্তু বোটক্স আসলে কী, সেটা অনেকেই জানি না। তাই আসুন, আজ বোটক্স সম্বন্ধে কিছুটা জেনে নিই।

বোটক্স-এর পুরো নাম হল বটুলিনাম টক্সিন (BTX)। এটি একটি নিউরোটক্সিন অর্থাৎ স্নায়ু ক্ষতিকারক বিষ। এটি তৈরি করে ও ছড়িয়ে দেয় ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিনাম নামক একটি ব্যাকটেরিয়া। এই ব্যাকটেরিয়াটি বোটুলিজম নামক একটি স্নায়ুরোগ সৃষ্টি করে। বোটুলিজম হওয়ার প্রধান কারণই হচ্ছে এই টক্সিনটি। এই টক্সিনটি শরীরের পক্ষে খুবই মারাত্মক। এর মারণ ক্ষমতা বা লিথাল ডোজ, সংক্ষেপে এলডি-৫০ মানে, যে পরিমাণ বিষ পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত প্রাণীদের ইঞ্জেকশান করলে, ইঞ্জেক্ট করা সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে অর্ধেক প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যখন এটি শিরায় বা পেশিতে ইঞ্জেক্ট করা হয়, তখন এর এল ডি-৫০ হল ১.৩-২.১ ন্যানোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম। যদি এই টক্সিনটি প্রশ্বাস-এর মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে এর এলডি-৫০ একটু বেড়ে যায়, এবং তা হয় ১০-১৩ ন্যানোগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটু বেশি পরিমাণে বিষ প্রয়োজন হয়।

মোটামুটি আট ধরনের বোটুলিনাম টক্সিন পাওয়া গেছে—এদের নামকরণ হয়েছে এ, বি, সি...এইচ। এদের মধ্যে এ ও বি মানুষের শরীরে বোটুলিজম সৃষ্টি করে। আবার এই দুই প্রকারই বাণিজ্যিক ভাবে ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সি থেকে জি প্রকার গুলি প্রকৃতিতে অতটা দেখা যায় না। 'এইচ' ধরনটি সবথেকে ক্ষতিকারক। এটির মাত্র ২ ন্যানোগ্রাম, একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

এই ব্যাকটেরিয়া (ক্লসট্রিডিয়াম বোটুলিনাম) খাবার-এর মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে, বিশেষ করে যদি কেউ ভাল করে রান্না না করা অথবা না-ফোটানো টিনজাত খাবার খায়। শরীরে (ত্বকে) যদি কোনো কাটা জায়গা থাকে, তাহলে সেখান দিয়েও এই ব্যাকটেরিয়াটি শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। টক্সিনটি শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়লে, স্নায়ু ও পেশীর কার্যক্ষমতা লোপ পায়। অসুখের তীব্রতা বেশি হলে, এই টক্সিনটি হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসের নার্ভগুলিকে অক্ষম করে দিয়ে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বোটুলিজম তাড়াতাড়ি ধরা পড়লে, এই রোগের চিকিৎসা সম্ভব। অনেক সময় বমি করিয়ে পাকস্থলি থেকে টক্সিন সহ খাবার বার করা হয়। কেটে যাওয়া জায়গায় অস্ত্রপ্রচার করে ব্যাকটেরিয়াকে শরীর থেকে বার করা হয়। রোগ নিরাময়ে অ্যান্টিটক্সিনও ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা শরীরের ক্ষতি আটকানোর চেষ্টা করা হয়। যে নার্ভগুলি আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলি কেবলমাত্র সময়ের সাথেই ঠিক হয়। সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা মৃত্যুর হারকে অনেকটাই কমিয়ে দিতে পারে।

ঘোড়ায় এই টক্সিন ইঞ্জেক্ট করে এদের দেহে অ্যান্টিবডি তৈরি করা হয়। এভাবে এ, বি ও ই শ্রেণির অ্যান্টিটক্সিন অ্যান্টিবডি বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হয়। আরেকটি অ্যান্টিটক্সিনও পাওয়া যায়—ঘোড়ার দেহে সি, ডি, ই, এফ, জি শ্রেণির টক্সিনের বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডি দিয়ে।

এবার বোটুলিনাম টক্সিনটি ঠিক কী ভাবে কাজ করে, সেটি জেনে নেওয়া যাক। তার আগে আমাদের একটু অ্যাসিটাইলকোলিন নামক নিউরোট্রান্সমিটার (স্নায়ু সংজ্ঞাবাহক বা বার্তাবাহক) সম্পর্কে জানতে হবে। নিউরোট্রান্সমিটার হল এক ধরনের রাসায়নিক যা স্নায়ু ও বিভিন্ন ধরনের কোষের মধ্যে বার্তা বহন করে। অ্যাসিটাইলকোলিন স্নায়ু ও পেশীর মধ্যে বার্তা বা সিগন্যাল পাঠায়। যখন কোনো কার্যবাহী স্নায়ু (মোটর নিউরোন)-এর মধ্যে কোনো সংকেত (সিগন্যাল) অতি দ্রুত স্নায়ু ও পেশীর সংযোগস্থলে পৌঁছায়, অ্যাসিটাইলকোলিন বেরিয়ে

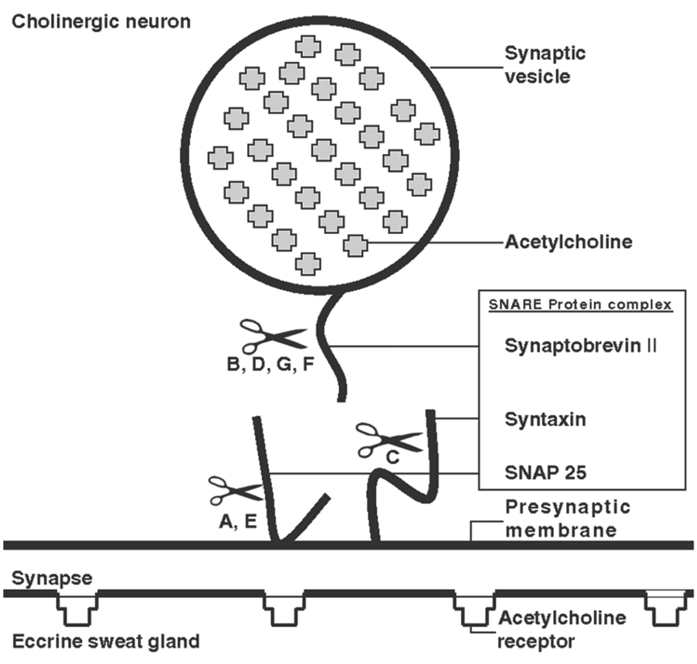

এসে কোষের গায়ে যে গ্রাহক (রিসেপ্টার) থাকে, সেখানে সংযুক্ত হয়। ফলে কোষের গায়ে অবস্থিত বিভিন্ন প্রণালী (চ্যানেল) খুলে যায়। এর ফলে সোডিয়াম আয়ন পেশীর কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও পেশীকে উদ্দীপিত করে। বটুলিনাম টক্সিনটি নিজে ওই পেশীর কোষের গায়ে যে রিসেপ্টার আছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়। যার ফলে অ্যাসিটাইলকোলিন আর সিগন্যালকে নিয়ে এগোতে পারে না। সিগন্যাল ওখানেই থমকে যায় ও পেশীর উদ্দীপনাও বন্ধ হয়ে যায়।

একজন জার্মান চিকিৎসক (নাম— জাস্টিনাস কার্নার) ১৮২০ সালে প্রথম বটুলিজম রোগটি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উনি এই রোগটির নাম দিয়েছিলেন 'সসেজ পয়জনিং'। ডা: কার্নার রবার্ট কচ-এর ছাত্র ছিলেন। এমিল ভন এরমেন জেম আবিষ্কার করেন যে এই টক্সিনটির প্রকৃত উৎস একটি ব্যাকটেরিয়া। নাম— ক্লসট্রিডিয়াম বোটুলিনাম। এই টক্সিনটির বিষদ বিবরণও প্রথমবার তিনি ব্যক্ত করেন। পরবর্তীকালে টেসমার স্লাইপ ও হারমান সমার নামক দুই বিজ্ঞানী এই টক্সিনটিকে শোধন করেন ও গবেষণা উপযোগী করে তোলেন।

বোটুলিনাম টক্সিনটির কিন্তু অনেক উপকারিতাও আছে, যেমন—

১) পেশীর কিছু রোগ আছে যেগুলিতে পেশীগুলি সবসময় প্রয়োজনের তুলনায় বেশি কাজ করে। এটিকে বলা হয় স্প্যাস্টিসিটি। স্ট্রোকের পরে, মেরুদণ্ডের আঘাত-এর ফলে কিংবা মাথা, ঘাড়, চোখের পাতা, চোয়াল-এর খিচুনীর জন্য এইরকম হতে পারে। স্প্যাস্টিসিটির আরেকটি কারণ হতে পারে খাদ্যনালী (ইসোফেগাস) ও মূত্রথলী (ব্লাডার)-র খিচুনী। এই স্প্যাস্টিসিটিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বোটক্স ব্যবহার করা হয়, যদিও তা খুবই অল্প মাত্রায়।

২) চোখের তারা যে সমস্ত পেশীগুলোর জন্য এপাশ ওপাশ ঘোরে, সেইগুলির মধ্যে যদি অসামঞ্জস্য থাকে, তখন চোখকে টেরা লাগে (পরিভাষায় স্ট্রাবিসমাস)। এই টক্সিনটি ইঞ্জেকশন দিয়ে ওই পেশীগুলিকে দুর্বল করে দেওয়া হয়। যার ফলে টেরা ভাব কমে যায়। এই চিকিৎসাটি বারবার করার দরকার হয় না। যদিও বোটক্স-এর প্রভাব মাত্র কয়েক মাস থাকে, তবুও কয়েকবার ইঞ্জেকশনটি নেওয়ার পর চোখের পেশী অভ্যস্ত হয়ে যায়।

৩) অত্যধিক ঘাম হওয়াকে বলে 'হাইপার হাইড্রোসিস'। বোটক্স এতেও কার্যকরী।

৪) বোটুলিনাম টক্সিন মাইগ্রেন রোগ থেকেও স্বস্তি দেয়।

৫) এই টক্সিনটি মুখের পেশীগুলিকে শিথিল করে ত্বককে মসৃণ করে। বৃদ্ধ বয়সে বলিরেখা থেকে মুক্তির এটি একটি অন্যতম উপায়। ত্বককে মসৃণ রাখার জন্য অবশ্য এই পদ্ধতিটি বারবার প্রয়োগ করতে হয়।

৬) বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জি, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাথা, স্নায়ু সংক্রান্ত (নিউরোপ্যাথিক) ব্যাথা ইত্যাদি সারাতেও একটি সহজ উপায় হল বোটক্স-এর ব্যবহার।

তবে এই টক্সিনটি দেওয়ার সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অসাবধানতার কারণে কোনো ভুল পেশীতে টক্সিনটি ঢুকে গেলে বা আশেপাশের পেশীতে ছড়িয়ে পড়লে, সেই পেশীর পক্ষাঘাত ঘটতে পারে। এই অসাবধানতার কারণে হার্ট অ্যাটাক, খিচুনী, শ্বাসকষ্ট ও মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। বলিরেখা কমানোর প্রক্রিয়ায় মুখের অন্যান্য পেশীগুলির পক্ষাঘাত হতে পারে। পেশীর দুর্বলতা, গিলতে অসুবিধা হওয়া ও মাথা ধরা জাতীয় অসুবিধেও হতে পারে।

পরিশেষে বলি, যদি এই বোটক্সকে বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় (অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তির নজরদারিতে), তাহলে এটি অনেক দুরারোগ্য রোগ নিরাময় করে বহু হতাশ মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম।

M. 9830428638

পত্রিকা যোগাযোগ ও প্রাপ্তিস্থান

স্টুডিও ইউনিক, কাঁচরাপাড়া M. 9332280602 ● জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 ● পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ বারাকপুর M. 8017402774/ 9331035550 ● প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 ● কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 ● তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 ● কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 ● গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 ● জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 ● কুনাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 ● নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 ● উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 ● ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365 ● শিয়ালদহ ও যাদবপুর, রানাঘাট, নৈহাটি, কল্যাণী, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, কাঁচরাপাড়া, মদনপুর, বাদকুল্লা, চুঁচুড়া, ব্যান্ডেল স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট) ●গৌতম শিরোমনি M. 7364874673 ●শকুন্তলা মুখার্জী, বনগাঁও M. 8116480129, সৌম্যকান্তি জানা, কাকদ্বীপ, বামা পুস্তকালয়, M. 9434570130 ●অনিশ মিত্র, দুর্গাপুর, M. 9093819373 ●অরিন্দম রায়, বোলপুর, M. 7001857013 ● সারথী চন্দ, শিলিগুড়ি, M. 9674031082 ●উত্তম দাস, আলিপুরদুয়ার, M. 9382307460 ●সবুজ পৃথিবী প্রযত্নে কোডেক্স, ৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯ ● শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব, M. 9609844676/7908341942 ● ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, M. 9635995476 ●দীপাঞ্জন দে, কৃষ্ণনগর ও চাপড়া, M. 9734067466 ●বহরমপুর রেলওয়ে বুক স্টল ও বিশ্বাস বুক স্টল, বহরমপুর বাসস্ট্যান্ড, M. 9474350231

গৌ ত ম ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

বিজ্ঞানের কাঠগড়ায় জ্যোতিষী চর্চা

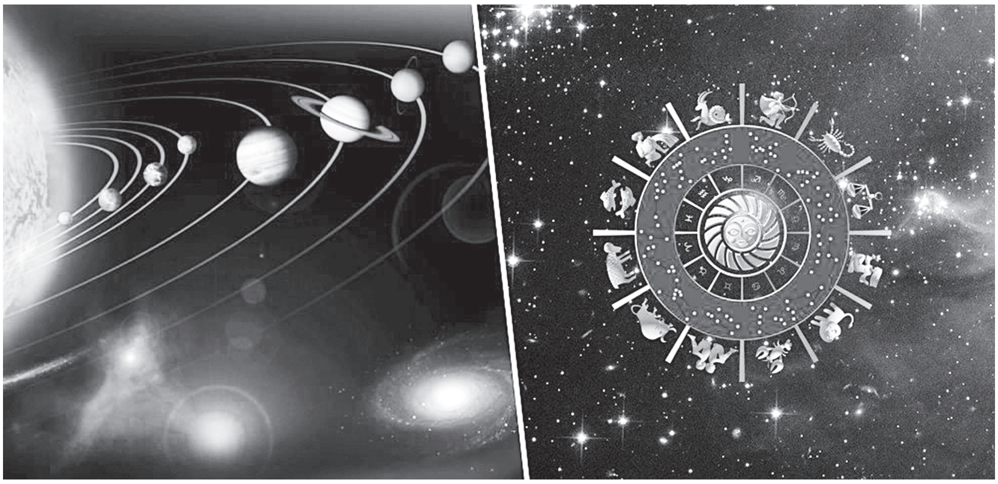

রত্ন জ্যোতিষীদের দাবি :

আকাশের রামধনু সাতটি মহাজাগতিক রশ্মির সমন্বয়। মানুষের শরীরে সাতটি স্নায়ুচক্র আবর্তিত। এক একটি রঙ এক একটি চক্রের নিয়ন্ত্রক। শরীরে এক বা একাধিক রঙ বা রশ্মি গ্রহণের অক্ষমতায় রোগ দেখা দেয়। যে রঙের ঘাটতি, সেই রঙের রত্ন ধারণে তার দ্রব্যগুণে সেই রঙের ঘাটতি মিটে যায়। যেমন নীলের ঘাটতিতে মৃগী। তাই সমাধান নীলা। রত্নপাথরগুলি কসমিক রশ্মি শোষণ করে শরীরকে রশ্মির ক্ষতিকারক দিক থেকে বাঁচায়।

বিজ্ঞান কী বলে?

মানুষের শরীরের স্নায়ুতন্ত্র দুটি ভাগে বিভক্ত—কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয়। সাতটি স্নায়ুচক্রের কোনো অস্তিত্বই নেই শরীরে। আলোক তরঙ্গের সাথে শরীরের ত্বকের সম্পর্ক, স্নায়ুতন্ত্রের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই মৃগী রোগে নীল পোষাক পড়লে কোনো প্রতিকার হয় না।

কোনো রশ্মির দ্রব্যগুণে রোগ সারে তখনই যখন রক্তে বা কোষে ঐ দ্রব্যের উপস্থিতি থাকে বা অভাব থাকে। কিন্তু রক্তে বা কোষে রত্নপাথরের উপাদানের উপস্থিতির কোনো প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। এছাড়া কসমিক রশ্মি ওজোন স্তর ও চৌম্বক প্রাচীর ডিঙিয়ে সরাসরি আসতে পারে না। নগণ্য কিছু এলেও তাদের শোষণ করার ক্ষমতা রত্নপাথরের পাওয়া যায়নি।

ধাতুর প্রভাব :

১. অষ্টধাতুর আঙটি বা মেটাল ট্যাবলেটের ধাতুগুলি শরীরে গিয়ে এর অভাব মেটায় ও রোগ নিরাময় করে—এ কথা একেবারে ভিত্তিহীন, তা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

২. ঐ জাতীয় আঙটিতে থাকে মূলত দস্তা, সীসা ও পারদ। মানব শরীরে দস্তার প্রয়োজন এক গ্রামেরও কম এবং তা ধাতুরূপে নয়, বিশেষ যৌগরূপে। শরীরে সীসা ও পারদের প্রয়োজন তো নেইই, বরং বিষক্রিয়া শরীরের ক্ষতি করে।

৩. চামড়া বা ত্বকের উপর ধাতু থাকলে শরীর তা কোনো ভাবেই শোষণ করে না। বরং এরা চামড়ার সাথে বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে চামড়ার দুরারোগ্য রোগ বা ক্যানসারও ঘটাতে পারে।

জ্যোতিষের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকায় টিকে থাকার স্বার্থে তাকে নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যে রত্নটি বিক্রি করতে হয়, সেটি বাদে বাকিগুলির উপর বিশুদ্ধ জল দেওয়া হয়। পাথরের রঙ অপরিবর্তিত থাকে। যেটি বিক্রি করলাম, তার উপর চুনজলের সাথে ফেনপথ্যালিন দ্রবণ দেওয়া হয়। চুনজলের ক্ষারীয় গুনে ফেনপথ্যালিন গোলাপী বর্ণ নেয়। সকলে মনে করে ঐ পাথরটি জাগ্রত। মারকিউরাস ক্লোরাইডের সংস্পর্শে এসে অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম মিশ্রিত ধাতু ভীষণ উত্তপ্ত হয়ে ধোঁয়া ওঠে, তারপর ছাই হয়ে পড়ে। এই বিক্রিয়াকে ব্যবহার করে মাদুলি দেওয়া হয়। মাদুলি গরম হয়ে ধোঁয়া ওঠে। তারপর মাদুলির গা থেকে ছাই পড়ে, যাকে বিভূতি নামে চালানো হয়।

তাহলে জ্যোতিষীরা কিভাবে বিশ্বাস অর্জন করে?

অজানা আর অলৌকিকের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার প্রবণতা থাকে দুর্বল মানুষের মনে। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হবার ধকল থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। দায়মুক্ত হওয়া যায়। মনের এই অবস্থায় জ্যোতিষীর যে বাণী অনুকূলে, তাকে বিশ্বাস শুধু নয়, আঁকড়ে ধরে। যে বাণী প্রতিকূলে, বুদ্ধি করে জ্যোতিষীরা তা থেকে বাঁচবার পথ বাতলে দেয়। ভয়ে ও বিশ্বাসে দুর্বল মানুষ হাজার হাজার টাকা খরচ করে বসে। জ্যোতিষীরা বলে গত বছর দুর্ঘটনার যোগ ছিল। মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তাই ঘটনাকে দুর্ঘটনা ভাবতে ভালো লাগে। অতি ছোটখাট ঘটনা বা দুর্ঘটনা তো ঘটেই থাকে। আর তখন জ্যোতিষীর কথায় মিল খুঁজে পায়। গণিতের সম্ভাব্যতা সূত্র (Mathematical Probability) অনুযায়ী অনেক কথা এমনিই মিলে যায়। মিলে যাওয়াগুলোকে মনে রাখে। কারণ দুর্বল মানুষ নির্ভর করতে চায় বলে বিশ্বাস করতে চায়। আর তাই না মেলাগুলো ভুলতে চায় বলে হারিয়ে যায়।

জ্যোতিষী বলল—আপনার পেটের গন্ডগোল আছে। কী করে বুঝল? ভারতবর্ষের মত ট্রপিক্যাল দেশে পেটের গন্ডগোল অতি সহজলভ্য। মিল খুঁজে পেতে চাই বলে পেয়ে যাই। প্রশ্ন ওঠে না মনে। জ্যোতিষীদের প্রতি বিশ্বাস জিনিসটায় সহজে আঁচড় পড়তে

পারে না। জ্যোতিষী বলল—আপনাকে জীবনে ভীষণ সংগ্রাম করে বড় হতে হয়েছে। কার না ভাল লাগে। জীবনের ছোট ছোট চেষ্টাকে সংগ্রাম বলে ভাবতে! তাই বিশ্বাসও হয় জ্যোতিষী কি করে ধরে ফেলল!

জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণীও করে বেশ হিসেব করে। 'শরীর আশানুরূপ ভাল থাকবে না', 'আর্থিক লাভ হলেও খরচের ভার বাড়বে'—এ জাতীয় কথা সকলেরই সবসময় ঠিক বলেই মনে হয়। বিশ্বাস, ভরসা আর আশ্রয়ের বিশাল বৃক্ষের যে ছায়াবীথি রচনা করেছে জ্যোতিষ, তার শেকড় কিন্তু ভবিষ্যৎ মিলে যাওয়া। আর এই শেকড়ের মাটি হল মিল খুঁজে পেতে চাওয়া মানুষের দুর্বল মন। তাই যুক্তি, বিশ্লেষণ আর ভাবনার দায় থেকে মুক্তি পেতেই ভেতরের দুর্বলতা সমর্পণ করে এই অন্ধত্বের কাছে।

গ্রহ-নক্ষত্রের যে ভূত ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করে দেয়, এই তত্ত্বের সাথে হিন্দুদের কর্মবিপাক তত্ত্ব (এ জন্মের পাপের ফল পরজন্মে), বিধিলিখিত নিয়তি অর্থাৎ নিয়তিবাদ (জীবন পূর্বনির্ধারিত), মানুষ নিমিত্তমাত্র—এ তত্ত্ব ভালরকম খাপ খেয়ে যায়। তাই হয়ত হিন্দুধর্মের ভেতর জ্যোতিষশাস্ত্রের এই সৌধ আজও অটুট।

শেষের কথায় আসি :

সীমাহীন এই মহাবিশ্বে আমাদের সর্বশেষ আবেগ হল বিস্ময়। তবু বিজ্ঞানের পথ ধরে যতটুকু জানার জগৎ মানুষ তা দিয়েই অনুমান করে এই সীমাহীনতাকে। তাতে কোনো ফাঁকি থাকে না। মিথ্যে থাকে না। কিন্তু আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—আমাদের অস্তিত্ব। থাকা না থাকার বিপন্নতা। দুর্বল মানুষ সেই অনিশ্চয়তার বিপন্নতার মুখোমুখি হতে না পেরে রচনা করে তোলে কাল্পনিক মিথ্যে পুতুল খেলার মত জ্যোতিষ রাজ্য। সেখানে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ হতে চায়। শান্তি পেতে চায়। অলৌকিক শক্তির কাছে অন্ধ সমর্পণ করে দায়মুক্ত হতে চায়। কিন্তু সে তো মিথ্যে জগৎ। যে মানুষ নিজেকে ফাঁকি দিতে পারে না, সে অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হয় বিপন্নতা নিয়েই। তাই দু-হাতের সাজানো আঙুলের নীলা, পলা, চুনী ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা ও অগভীরতাকেই প্রকাশ করে। সে মানুষই সুন্দর যে অনিশ্চয়তা নিয়েই সত্যের মুখোমুখি হতে জানে।

(সমাপ্ত)

email: gbandyo55@gmail.com • M. 9748127195

অরিজিৎ শূর

কালোকথা

ধরা যাক, আপনি বাড়ি থেকে বেড়াবেন। আর গেটের মুখ থেকে চলে গেল, একটা সুন্দর গাড়ি। হয়ত আপনি বাজার করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গাড়িটা আপনার এতই পছন্দ হয়ে গেল যে আপনি বাজার টাজার বাদ দিয়ে চলে গেলেন গাড়িটির পিছন পিছন। এবং আরও কাছ থেকে দেখতে লাগলেন গাড়িটা। বেশ কিছুদূর যাবার পর আপনি দেখতে পেলেন গাড়িটা একটা লরির সাথে ধাক্কা খেল আর হয়ে গেল একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা। আর আপনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "ভাগ্যিস গাড়িটা ছিল" নাহলে আর আপনি—যাক্‌গে। এবার এই একই কাহিনিতে একটা বিড়াল ঢুকিয়ে দিন। তারপর দেখুন। বুঝলেন না তো। দাঁড়ান বলছি। এখানে ভাবুন একটা বিড়াল গেটের মুখ থেকে চলে গেল। আপনি খানিক দাঁড়িয়েও থাকলেন গেটের সামনে। হঠাৎ ঐ সুন্দর গাড়িটা চলে এল। ব্যস এবার সেম টু সেম সেই একই কথা একই কাহিনি। কিন্তু এবার গাড়িটা ধাক্কা লাগার পর আপনি গাড়িটার কথা ভুলে গেলেন আর শুধু শুধু দোষ দিলেন ঐ বেড়ালটাকে। আর যদি সে বেড়ালটা কালো হয়, তবে তো আর কথাই নেই। এক্ষেত্রে পাঠকের আর বুঝতে দেরি নেই বেড়াল বা গাড়ি কেউই শুভ অথবা অশুভ হতে পারে না। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় বিড়াল রূপ বদল করে হয়ে যায় মানুষ বা আরও অনেককিছু। কখনও নিজের মুখকেই মানুষ অশুভ ভাবতে শুরু করে। কখনও ড্রেনের জলকে শুভ মনে হয়। কোন এক টিভিতে একটি বিজ্ঞাপনেও দেখা যায় 'একটি বাচ্চা তার মাকে বলছে, তোমার মুখটা আমাদের জন্য শুভ'। তবে এর উল্টোদিকে এটাই ধরে নিতে হবে নিশ্চয় কারও না কারও মুখ অশুভ।

আজকের দিনে যেখানে সূর্য পূর্বদিকে উঠলেও প্রশ্ন করা হচ্ছে 'কেন সূর্য পূর্বদিকেই উঠবে?' (যদিও আমরা জানি সূর্যের কোনো ওঠা নামা নেই)। সেখানে এরকম বিজ্ঞাপন মানুষকে যে একশো বছর পিছিয়ে দিচ্ছে না সেটা কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। অথচ প্রশ্ন না করে আমরা কেমন নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছি। এর পিছনে একটা কারণকেই দাবি করা যায়—"ম্যাজিকের কাছে লজিক অনেকটাই পিছিয়ে আছে"।

email : arijitsur<kabiarijit@gmail.com

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

টিকা-নির্ভর হার্ড ইমিউনিটি

ভারতের নিবিড় টিকাকরণ প্রচেষ্টা

বছরের শুরুতেই দেশবাসীর জন্য পাওয়া গেল সুখবরটা। জানুয়ারির গোড়াতেই ভ্যাকসিনের জরুরি ব্যবহারের ছাড়পত্রে অনুমোদন দিল কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ামক সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটি ওরফে ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার 'সাবজেক্ট এক্সপার্ট গ্রুপ'। ভারতে ছাড়পত্র পেয়ে গেল অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রা জেনেকার তৈরি টিকা-' কোভিশিল্ড' এবং ভারত বায়োটেক ও আই সি এম আর-এর যৌথ উদ্যোগে তৈরি দেশীয় টিকা-কোভ্যাক্সিন। টিকাকরণের কাজ শুরু করা গেছে।

সরকারি সিদ্ধান্তে এটা স্পষ্ট যে, টিকাকরণের মাধ্যমে সমস্ত জনগোষ্ঠীতে হার্ড ইমিউনিটি তৈরির একটা প্রচেষ্টা থাকবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশের অন্তত ৬০ শতাংশ মানুষকে টিকা প্রদানের মাধ্যমে কোভিডের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ সামনে আসছে ভ্যাকসিন প্রদানের মধ্যে দিয়ে জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক প্রতিরোধ (হার্ড ইমিউনিটি) তৈরি করার তত্ত্ব। ভ্যাকসিন হাতে আসার আগেও হার্ড ইমিউনিটি নিয়ে হয়েছে বিস্তর চর্চা। দেখা গেছে, একটি জনগোষ্ঠীর ৬০-৭০ শতাংশ মানুষের মধ্যে কোনও সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মালে (শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরির মধ্যে দিয়ে), বাকি জনগণ রোগটি থেকে রক্ষা পায়। স্বাভাবিক নিয়মে রোগ সংক্রমণের মাধ্যমে বা টিকাকরণের মাধ্যমে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হয়, তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে গোটা শতাব্দী ব্যাপী।

প্রসঙ্গত বলি, 'হার্ড' কথাটি এসেছে 'গরুর পাল' থেকে। আমেরিকার কানসাস প্রদেশের প্রাণী চিকিৎসক জর্জ পটার ১৯১০ থেকে ১৯১৬ সালে চলা গরুর কন্টাজিয়াস অ্যাবর্সন (পড়ুন ব্রুসেলোসিস রোগ) মহামারীর অভিজ্ঞতা থেকে লক্ষ করেন আক্রান্ত গরুর পালে বাইরের থেকে নতুন গরু প্রবেশ না করলে আক্রান্ত অথচ বেঁচে যাওয়া গরুগুলোর মধ্যে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়, তা কম সংখ্যক সুস্থ গরুকে রোগ আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।

১৯১৬ সালে 'জার্নাল অফ আমেরিকান ভেটেরিনারী অ্যাসোসিয়েশন'-এ এই বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে, তা বিজ্ঞানীমহলে আলোড়ন তৈরি করে। ব্রিটেনে এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। সেগুলি ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয় 'ভেটেরিনারী রিভিউ এন্ড স্কটিশ এগ্রিকালচারাল' জার্নালে। চিকিৎসাবিজ্ঞানী উইলিয়াম টপলে ১৯১৯ সালে 'ল্যানসেট' জার্নালে এবং ১৯২৩ সালে 'জার্নাল অফ হাইজিন'-এ ইঁদুর-এর ওপর করা গবেষণায় প্রাপ্ত হার্ড ইমিউনিটি তত্ত্বকে সামনে আনেন। এরপর ১৯২৪ সালে ডিপথেরিয়া মহামারীর প্রতিরোধ বর্ণনায় কোলস ডুডলে 'ল্যানসেট' জার্নালের প্রবন্ধে প্রথম মানুষের হার্ড ইমিউনিটি বিষয়টির অবতারণা করেন। তিনি 'ইংলিশ হার্ড' ও 'হিউম্যান হার্ড' শব্দগুলিকে প্রতীকী হিসাবে ব্যবহার করেন, যা পরবর্তীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এপিডেমিওলজি শাখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

প্রসঙ্গক্রমে জানাই, ল্যাটিন শব্দ 'ভ্যাক্কা'-র অর্থ গরু। অণুজীববিদ্যার জনক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর ১৮৯০ সালে এডওয়ার্ড জেনারের স্মলপক্স টিকাকরণের (১৭৯৬) ইতিহাসকে স্মরণে রেখে ভ্যাকসিন নামকরণকালে এই ভ্যাক্কা শব্দটি ব্যবহার করেন। আসলে, জেনার মানুষের স্মলপক্স প্রতিরোধে গরুর পক্সের নির্যাস ব্যবহার করেছিলেন। ভ্যাকসিন দিয়ে হার্ড ইমিউনিটি তৈরির সময় কাকতালীয়ভাবে গরুর প্রসঙ্গ এসেই যায়। তবে এই নিয়ে অহেতুক মাতামাতি করা বা এর অন্য কোনও মানে খোঁজার চেষ্টা হবে একেবারেই যুক্তিহীন ও বিজ্ঞান-বর্জিত।

৭০-এর দশকের গোড়ায় 'স্মলপক্স ইরাডিকেশন প্রোগ্রাম' এবং মিজিলস, পোলিও, রুবেলা টিকাকরণের সাফল্যে 'হার্ড ইমিউনিটি' আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়। এবারও প্রসঙ্গ উঠেছে কিভাবে সঠিক টিকাকরণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করা যায় এবং সংক্রমণ রোধ করা যায়। সংক্রমণ রোধ করাই হার্ড ইমিউনিটির মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনও সংক্রামিত ব্যক্তি থেকে যতজন মানুষে রোগ ছড়িয়ে পড়ে, তাকে রিপ্রোডাকশন নাম্বর (Ro) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। Ro নির্ধারণ করার কতগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। গোড়ার দিকে কোভিডের ক্ষেত্রে এটি 'তিন' ছিল। তার মানে একজন মানুষ তিনজন মানুষকে সংক্রমণ

ছড়াচ্ছিলেন। এই সময় এটি '১' ও '২'-এর মধ্যে রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক 'ইমিউন থ্রেশড' বাড়িয়ে বর্তমানের অতিমারি রোখা যাবে। একটি জনগোষ্ঠীর ন্যূনতম প্রতিরোধ সামর্থ্য গড়তে দরকার 'ক্রিটিক্যাল ভ্যাকসিন লেভেল', যা (১-১/Ro) দিয়ে সূচিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে Ro-এর মান ২ হলে, ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে টিকা দিলেই হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করতে পারা যাবে। ভাইরাস সংক্রমণের শৃঙ্খল ছিন্ন করে অতিমারিতে রাশ টানা যাবে।

তবে টিকাকরণ হলেই করোনা ভাইরাস পৃথিবী থেকে বিদায় নেবে না বা আমরাও সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হব না। তাই ভিড় এড়িয়ে চলা, মাস্ক পরা, সাবান-জলে হাত ধোঁয়ার মতো কোভিড স্বাস্থ্যবিধি এখনও আমাদের মেনে চলতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, করোনা ভাইরাসকে এই মুহূর্তে পুরোপুরি তাড়াতে না পারলেও আয়ত্বে অবশ্যই আনা যাবে। সম্পূর্ণ নির্মূল করতে প্রয়োজন আরও বড় উদ্যোগ, এটি তার মহড়া।

এখন প্রশ্ন, বহু অর্থব্যয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি করা ভ্যাকসিনগুলো কোভিড-এর বিরুদ্ধে কাজে আসবে তো? এই বিপুল কর্মযজ্ঞে মানুষকে যুক্ত করা যাবে তো, যখন টিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, টিকার কার্যকারিতা (এফিকেসি) এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে মানুষের মধ্যে রয়েছে একরাশ সংশয়।

এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে অনুমান করেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যদপ্তর তৈরি করেছে 'কোভিড-১৯ কমিউনিকেশন স্ট্র্যাটেজি'। এতে আলোচিত বিষয়গুলিকে কিভাবে মোকাবিলা করা যাবে, দেওয়া হয়েছে তার রূপরেখা। তবে শুধুমাত্র পরিকল্পনা করলেই চলবে না। মানব কল্যাণের এই মহতি উৎসবে চাই এর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। বর্জন করতে হবে অহেতুক কৃতিত্ব প্রদর্শন ও দোষারোপের অপচেষ্টা।

আশা করব, বৃহৎ এই কর্মকান্ডে সমস্ত রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে এক সামগ্রিক প্রয়াস নেওয়া হবে। চাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরগুলোর মধ্যে সুসমন্বয়। সঙ্গে চাই স্বাস্থ্যকর্মী, এনজিও, গণমাধ্যম, সমাজ ও বিজ্ঞানকর্মী এবং সমাজের সমস্ত মানুষকে সামিল করার সৎ উদ্যোগ।

টিকা সংক্রান্ত যাবতীয় সংশয় ও ধোঁয়াশা কাটাতে অবিলম্বে প্রকাশিত হোক একটি করোনা-টিকা নীতি ও একটি শ্বেতপত্র, এটাই সময়ের দাবি।

email:joardar69@gmail.com • M. 9231533335

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাগজের তৈরি চায়ের কাপে চা পানের বিপদ

"একটা চা"। বলতে না বলতেই দোকানি একটি কাগজের কাপে গরম চা ঢেলে আমার হাতে দিল। দোকানির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কাগজের কাপ কেন, কাঁচের গ্লাস নেই?" অন্য খদ্দেরদের চা দিতে দিতে বলল, "কাঁচের গ্লাস তো অনেকদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে, এখন তো কাগজের কাপই চলছে। এর আগে অবশ্য প্লাস্টিকের কাপ ছিল। সেটা নাকি বিষাক্ত, তাই বন্ধ হয়ে গেছে। এখন সবাই কাগজের কাপেই খায়। এতে নাকি বিষ নেই।"

চা পানের কাপ বাড়িতে সাধারণত চিনামাটির পাত্র ব্যবহার করে থাকি। বড় বড় হোটেল বা রেঁস্তোরাগুলিতেও চা পানের পাত্র হিসেবে চিনামাটির কাপ-ডিশ-এর ব্যবহার হয়। সমস্যা রাস্তার ধারের চা বিক্রির দোকানগুলিকে নিয়ে। এক সময় এরা তৈরি চা পরিবেশনের জন্য কাঁচের গ্লাস ব্যবহার করত। বিশেষ মাপের গ্লাস দোকানগুলিতে সার দিয়ে সাজানো থাকত। একই গ্লাস বারবার ধুয়ে ব্যবহার করা হত। কোনো কোনো খদ্দের সেটা পছন্দ করতেন না। তাঁদের জন্য থাকত মাটির ভাঁড়। একবার চা পানের পর সেগুলি ফেলে দেওয়া হত, বারবার ব্যবহার করা হত না। হঠাৎ করেই এদের অপসারণ করে বাজার দখল করে নিল প্লাস্টিকের কাপ। ছোটবড় নানা মাপের এই কাপগুলিতে গরম চা পান স্বাস্থ্যসম্মত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানপ্রচারকদের ক্রমাগত প্রচারের ফলে এই বিষাক্ত কাপ ব্যবহারে এক সময় ভাঁটা পড়ে। এল থার্মোকলের কাপ। থার্মোকল প্লাস্টিকের চেয়ে যে কম ক্ষতিকর নয় সেটা বুঝতে মানুষের বেশি সময় লাগল না। তাই এই কাপ বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি।

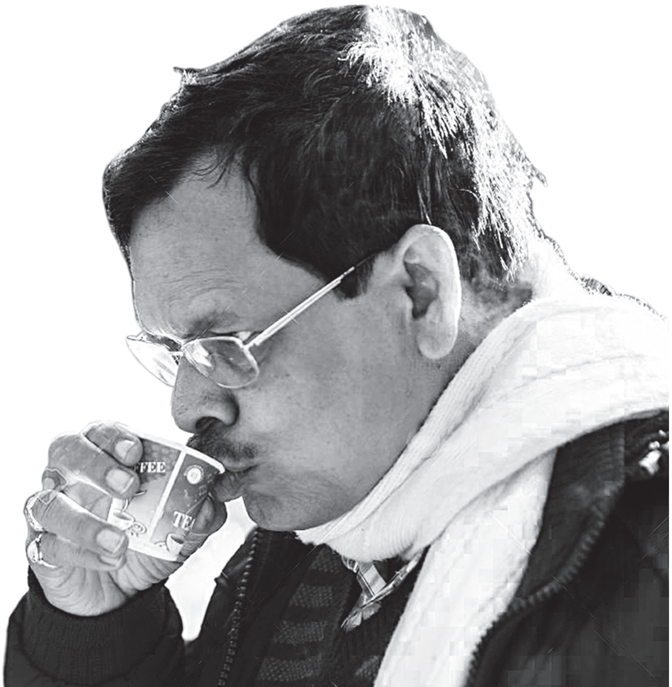

শুরু হল বিকল্পের খোঁজ। কাঁচের গ্লাস বা মাটির ভাঁড় আবার ফিরে যাওয়ার কথা মানুষ যখন ভাবতে শুরু করেছে তখনই দোকানে দোকানে জায়গা করে নিল কাগজের কাপ। সবাই খুশি। যাক, একদিনে পাওয়া গেল গরম চা পানের স্বাস্থ্যসমমত ও পরিবেশবান্ধব এক উপকরণ।

সত্যিই কি নিশ্চিন্ত হওয়া গেল? অনেকে হয়ত ভাবছেন, কাগজ তো পরিবেশবান্ধব আর এতে এমন কোনো রাসায়নিক পদার্থ নেই যার দ্বারা শরীরের মারাত্মক কোনো ক্ষতি হতে পারে—তাহলে এমন প্রশ্ন কেন? এমন প্রশ্ন করার কারণ কাগজ নিয়ে নয়, কাপ তৈরির পদ্ধতি নিয়ে। দেখা যাক, কীভাবে এই কাপ তৈরি হয়।

কাগজে অসংখ্য ছিদ্র থাকে। জল বা জলীয় পদার্থের সংস্পর্শে এলে সেই জল ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কাগজের তন্তু ভিজিয়ে দেয়। তখন কাগজ বা কাগজের তৈরি পাত্র আর ব্যবহার করা যায় না। কাগজের কাপে গরম চা ঢালা সত্ত্বেও এমন কিছু ঘটে না। এর কারণ এই ছিদ্রপথ বন্ধ করতে এর গায়ে (ভিতরে ও বাইরে) প্লাস্টিক বা মোম জাতীয় উপাদান দিয়ে তৈরি একটি অতি পাতলা জামা পরিয়ে দেওয়া হয়। কাপে গরম চা ঢাললে তা এই প্লাস্টিক বা মোমের আবরণের সংস্পর্শে আসে। মোম প্রধানত দু-ধরনের হয়। প্রাকৃতিক বা মৌমাছির মোম এবং কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মোম। রসায়নাগারে তৈরি কৃত্রিম মোম বা প্যারাফিন নানা ধরনের হয়। প্রাকৃতিক মোম শরীরের তেমন ক্ষতি না করলেও কৃত্রিম মোম বিপাক ক্রিয়ায় ক্ষতি করে। মোমের পরিবর্তে যদি প্লাস্টিক থাকে তাহলে তো কথাই নেই, প্লাস্টিক কাপের মতোই ক্ষতিকারক। যেহেতু গবেষণাগারে তৈরি প্যারাফিন বা মোম প্রাকৃতিক মোমের তুলনায় দামে অনেক সস্তা তাই ধরে নেওয়া যায় কাগজের কাপে কৃত্রিম প্যারাফিনের প্রলোপ দেওয়া হয়। কাপের গায়ে যদি প্যারাফিন জাতীয় যৌগের প্রালেপ থাকে তাহলে গরম চায়ের সংস্পর্শে এসে তা চায়ের সঙ্গে মিশে যায় আর প্লাস্টিকের আবরণ থাকলে বেরিয়ে আসে বিসফেনল। এগুলি চা পানের সময় পাচনতন্ত্র ও পাকস্থলীতে সহজে পৌঁছে যায়। দীর্ঘদিন ধরে যৌগগুলি পাকস্থলীতে জমতে জমতে পচনতন্ত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এর ফলে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার সম্ভাবনা থাকে। যতই ভালো খাওয়া দাওয়া করা হোক না কেন এক সময় কোনো কিছুই আর ঠিক করে পাচিত হবে না। ফলে শুরু হবে অ্যাসিডিটির নরক যন্ত্রণা। এছাড়াও কাগজের কাপের ব্যবহার যত বাড়বে, গাছ কাটার সম্ভাবনা তত বৃদ্ধি পাবে। তাই বলা যায়, কাগজের কাপে চা খাওয়া মানে পরোক্ষে বিশ্ব উষ্ণায়নে সাহায্য করা।

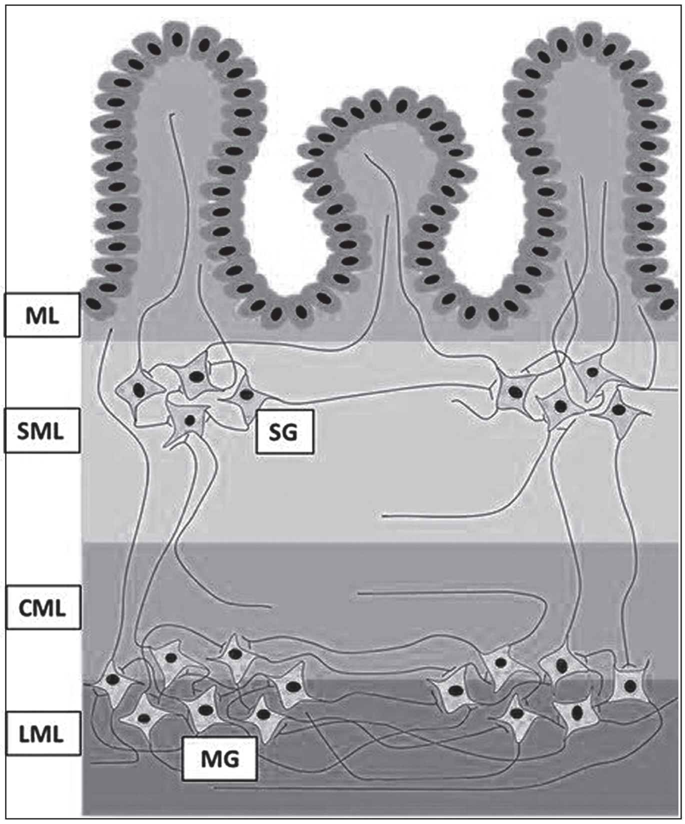

বিসফেনল পাকস্থলী ও অন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে

পলিইথিলিন, প্যারাফিন ইত্যাদি যৌগের প্রলেপ দেওয়া কাগজের কাপে দীর্ঘদিন চা পান করলে গরম চা-এর সঙ্গে এই যৌগগুলি মিশে যায়। চা-এর সঙ্গে পাকস্থলীতে গিয়ে সেগুলি জমতে থাকে। এতে এক সময় পাচকতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ভবিষ্যতে কোনো খাবারই আর ঠিক করে পাচিত হয় না। বাকি জীবন অ্যাসিডিটির শিকার হতে হয়। এছাড়াও ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যানসারের মতো ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। হরমোন ক্ষরণেও বিঘ্ন ঘটতে পারে।

শুধু কাপই নয় বর্তমানে থালা বাটিও তৈরি করা হচ্ছে কাগজ দিয়ে। উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শক্তি এবং পণ্যের ব্যবহার করা হয়, সে পরিমাণ-এর ব্যবহার করা হয় না। এই সব কাগজের তৈরি পাত্র একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া হয়। শুধু আমেরিকাতেই প্রতি বছর ৫৮ বিলিয়ন কফির কাপ গারবেজ বক্সে জমা হয়। এবারে একটা হিসেব কষা যাক। ধরা যাক একটি কাগজের কাপের দাম ২ থেকে ৩ টাকা। ওই কাপে চা বা কফি পান করতে সময় লাগে ৩ থেকে ৫ মিনিট। তাহলে বলা যেতে পারে প্রতি ৩ থেকে ৫ মিনিটে ২ থেকে ৩ টাকা মূল্যের প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে। হিসেবটা একটু অন্যভাবে দেখা যাক। প্রতি বছর বিশ্বে ২ কোটির বেশি গাছ কাটা হয় শুধুমাত্র কাগজের কাপ তৈরির জন্য। তাহলে প্রতিদিন কটা গাছ কাটা হচ্ছে তা ঐকিক নিয়মের সাহায্যে খুব সহজেই বার করে নেওয়া যায়।

তাহলে বিকল্প কী? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে এখানেই আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। ওয়ান টাইম কাপ বা থালাবাটি ব্যবহার না করে কাঁচের গ্লাস, চিনেমাটির কাপ-ডিশ বা স্টিলের তৈরি মগ ইত্যাদির মতো পুনর্ব্যবহারযোগ্য জিনিস ব্যবহার করতে হবে। তাহলে অন্তত চা পানের বিষক্রিয়া থেকে নিজেকে সুস্থ রাখতে সক্ষম হব।

email:kbb.scwriter@gmail.com • M. 9433145112

এই স্থানের দাতা

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

জ গ দী শ চ ন্দ্র ব সু

স্বতঃস্পন্দন

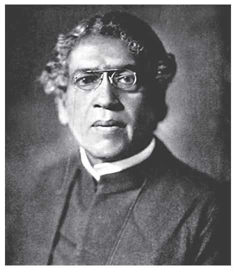

জগদীশ চন্দ্র বসু (জন্ম : ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮, মৃত্যু : ২৩ নভেম্বর ১৯৬৭)

জীবদেহে অংশ বিশেষে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। মানুষ এবং অন্যান্য জীবে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনা আপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে। কোনো ঘটনাই বিনা কারণে ঘটে না। কিন্তু জীবস্পন্দন কি করিয়া স্বতঃসিদ্ধ হইল? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

তবে উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়; তাহার অনুসন্ধানফলে সম্ভবত জীবনস্পন্দন রহস্যের কারণ প্রকাশিত হইবে।

শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন। হৃদয় জানা কথাটি শারীরিক অর্থে ব্যবহার করিতেছি, কবিতার অর্থে নহে। সমস্ত ব্যাঙটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে; এজন্য তাঁহারা হৃদয়টিকে কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কি কি অবস্থায় হৃদয়গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দনী বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ দিলেই স্পন্দন ক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুতবেগে সম্পাদিত হয়; কিন্তু ঢেউগুলি

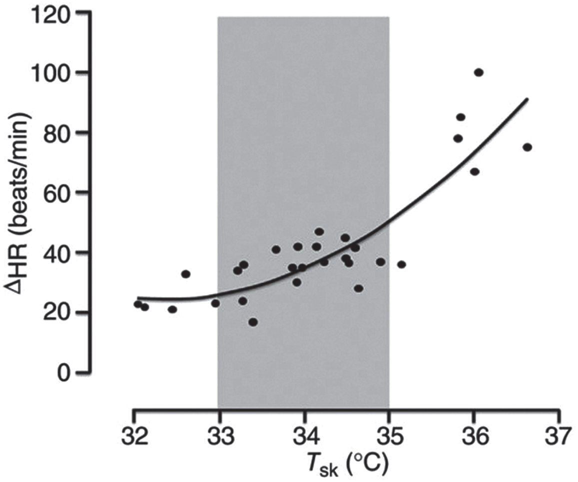

চর্মে উচ্চ তাপমাত্রায়, হৃদস্পন্দন হার বৃদ্ধি

খর্বকায় হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভেষজ দ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্ন রূপে পরিবর্তিত হয়। ইথার প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফর্মের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য রহস্য এই যে, কোনো বিষে হৃদয়স্পন্দন সংকুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিস্পন্দিত হয়। এইরূপ পরস্পরবিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষের ক্রিয়া ক্ষয় হইতে পারে।

জীবের স্বতঃস্পন্দন সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই কয়টি প্রধান ঘটনা বর্ণনা করিলাম। গাছেও কি এই সমস্ত আশ্চর্য ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়? নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া কোনো কোনো উদ্ভিদপেশীও যে স্পন্দনশীল তাহার বহুবিধ প্রমাণ পাইয়াছি।

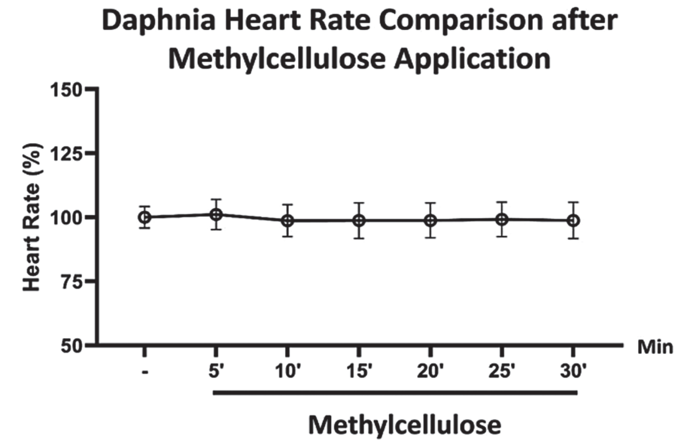

মিথাইল সেলুলোজ প্রয়োগে ডেফনিয়ার হৃৎস্পন্দন হার

বনচাঁড়ালের নৃত্য

বনচাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনা আপনি নৃত্য করে। লোকের বিশ্বাস যে হাতের তুড়ি দিলেই নৃত্য আরম্ভ হয়। গাছের সংগীতবোধ আছে কি না বলিতে পারি না, কিন্তু বনচাঁড়ালের নৃত্যের সহিত তুড়ির কোনো সম্বন্ধ নাই। তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া, জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চয়রূপে বলিতে পারিতেছি।

প্রথমতঃ, পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নল দ্বারা উদ্ভিদ রসের চাপ দিলে স্পন্দনক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তাহার পর দেখা যায় যে উত্তাপে স্পন্দনসংখ্যা বর্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে। ইথার প্রয়োগে স্পন্দনক্রিয়া স্তম্ভিত হয়; কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফর্মের প্রভাব মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যেভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে কোনো উদ্ভিদ পেশীতে আঘাত

বনচাঁড়াল

করিলে সেই মুহূর্তে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহারজনিত বল, বাহিরের আলোক, উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয় তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে। সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।

গাছের স্বতঃস্পন্দনে অনেক বৈচিত্র্য আছে। কতকগুলি গাছ অতি অল্প সঞ্চয় করিলেই শক্তি উথলিয়া উঠে, কিন্তু তাহাদের স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। স্পন্দিত অবস্থা রক্ষা করিবার জন্য তাহারা উত্তেজনার কাঙাল। বাহিরের উত্তেজনা বন্ধ হইলেই অমনি স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। কামরাঙা গাছ এই জাতীয়।

আর কতকগুলি গাছ বাহিরের আঘাতেও অনেককাল সাড়া দেয় না, দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা সঞ্চয় করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহাদের পরিপূর্ণতা বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন তাহাদের উচ্ছ্বাস বহুকাল স্থায়ী হয়। বনচাঁড়াল এই দ্বিতীয় শ্রেণির উদাহরণ।

মানুষের একটা অবস্থাকে স্বতঃ-উদ্ভাবনশীলতা অথবা উদ্দীপনা বলা যাইতে পারে। সেই অবস্থার জন্য সঞ্চয় এবং পরিপূর্ণতার আবশ্যক। কতকগুলি লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে, সেই অবস্থা স্বতঃস্পন্দনেরই একটি উদাহরণ বিশেষ। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে সেই অবস্থাভিলাষী সাধক চিন্তা করিয়া দেখিবেন কোন্ পথ—কামরাঙা অথবা বনচাঁড়ালের পদাঙ্কানুসরণ—তাঁহার পক্ষে শ্রেয়।

সংবাদ

পরিবেশ ও সমাজকর্মীদের সম্মেলন

পরিবেশ আকাদেমী (চন্দননগর) ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের উদ্যোগে ২৫ ডিসেম্বর ২০২০ চন্দননগর সবুজের অভিযান প্রাঙ্গণে পরিবেশ ও সমাজকর্মীদের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ২৭ জন পরিবেশকর্মী বক্তব্য রাখেন এবং বিভিন্ন সংস্থা তাদের কাজের প্রতিবেদন জমা দেন। বক্তারা নিজ নিজ জেলার নদীগুলির সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেন। জলের অপচয় রোধ ও পাশাপাশি প্লাস্টিক দূষণ ও প্লাস্টিকের বিকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সরস্বতী নদী সংস্কারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সম্প্রতি সরস্বতী নদী (৭৭ কিমি) সংস্কারের সরকারি আদেশনামা যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার কথা জোর দিয়ে উল্লেখ করা হয়। পাটশিল্প ও জুটমিলগুলি পুনরুজ্জীবনের জন্য ব্যাপক প্রচার আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা হয়। পরিবেশের বিভিন্ন

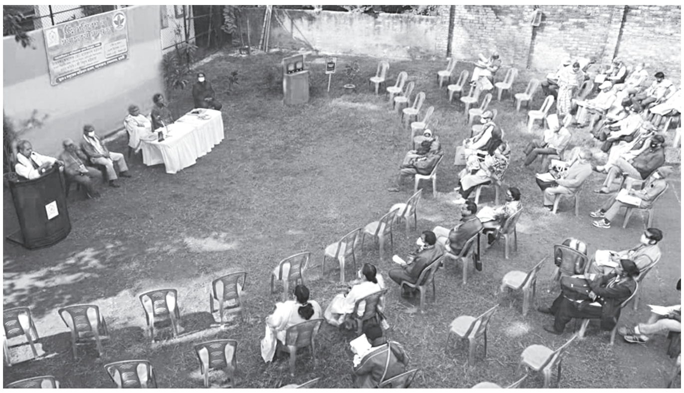

দাবিগুলি নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে।

সারাদিনের এই সম্মেলন পরিচালনা করেন বিশ্বজিৎ মুখার্জী, কুনাল ঘোষ, তরুণ সেনগুপ্ত ও জয়দেব দে প্রমুখ।

ক ল্যা ন মি ত্র

সাতের নামতা

একটা কুকুরের চিৎকার ঘন্টায় ক'মাইল ছুটে যায়
একজন মানুষের আর্তনাদই বা ঘন্টায় ক'মাইল

বন্দুকের গুলি যত তাড়াতাড়ি ছুটে যায়
আলোর গতি কি তার চেয়ে দ্রুত নয়।

তবে কেন আলো হাতে নিয়ে তুমি
        ট্রিগার থেকে সরিয়ে নিতে পার না আঙুল

ভালোবাসা কেন সাতের নামতা মুখস্থ বলতে পারে না

র থী ন্দ্র না থ ভৌ মি ক

আত্মঘাত

সাপ যে সাপ সেও আজ শাপে জর্জর
অনাহারে কাটে তার দিন
ইঁদুর ছেড়েছে তার গর্তের ভিটেখানি কবে—
খালি-পেটে হয় শীতঘুম!

ধানের দুধের গন্ধের চেয়ে বেশি
কীট-নাশা বিষ যে দাপায়
চড়ুই শালিক যত কীটভুক পাখি
বিষ-বাসে ধুকপুক হাঁপায়।

ফোর-জি তো প্রায় সব নিকেশ করেছে
বুলবুলি শালিক মৌটুসী
বাজার ধরতে নেমেছে আরো তেজী
দুনিয়া মুঠোয়-করা ফাইভ-জি।

সাপেদেরও চাই ডোজ এ্যান্টিভেনম
মানুষেরই রোগ উপশমে
বাস্তুতন্ত্রের নাভীশ্বাস উঠে গেছে
মানুষের কল্যাণে।

মাটিতে আকাশে সাত নদী জলে জলে
বিষ বিষ শুধু তীব্র বিষ
বাঁচার জন্য প্রাণ, যত প্রাণীকুল
অসম যুদ্ধে অহর্নিশ।

জ গ ন্ম য় ম জু ম দা র

গাছ চেনা

গাছ যাওবা চিনি
কি গাছের কাঠ বুঝি না।

যে কোনো কাঠেই ঘুন ধরে কম বেশি
যে কোনো কাঠেই থাকে বয়স বলয়।

করাতে চেরাই হলে গাছের শবের গন্ধ পাই
বিভিন্ন কাঠের বিভিন্ন গন্ধ
রুমাল লাগে না নাকে।

গন্ধেও কেউ কাঠ চেনে
আমি কাঠ চিনি না, গন্ধ চিনি না
দুয়েকটা গাছ চিনি মাত্র
পাতা দেখে চিনি, ফুল দেখে, এমনকি
                    ছালবাকল।

কাটা ছালে নুনের ছিটা দিলেও
গাছ তার নাম বলে না
স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতো।

সুনীল শর্মাচার্য

মহামারী বিষে

নীল ঘাম ঝরে সূর্য আলোকে
ঝিনুক বুকে জল,
মুক্তোর সুধা গিলে নেয় চুপে
জন্ম দেবার ছল।
অ্যামিবার মতো শতখণ্ডে
আত্মজাও খরখর,
ছত্রাক শুধুই বেড়ে ওঠে
সাংঘাতিক বর্বর।

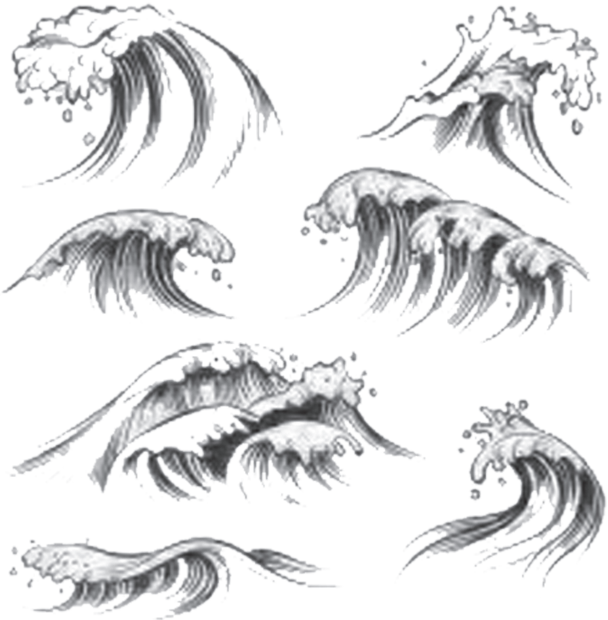

সাহসী বৃক্ষ বিস্মিত হয়েছে
মাটির রস বুকে,
তবুও হনু পোড়ায় লঙ্কা
কোন বিলাসীর সুখে।
মহাজাগতিক ক্রিয়া-কর্মে
চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ,
ঘূর্ণিনাভী চুষে নিয়ে সুনামি
সমুদ্রের স্মরণ!

ভ্রমরের মতো উন্মাদে খুঁজি গর্ভাশয়ের ঘুম,
বারোমাসে দেখি ঋতুর চক্র আহ্লাদে ঝুমঝুম!
ঘুরছে দেখছি কালের চাকা
চৌদিকে তার ঘর,
নিয়ম মেনে বাঁধা সবই,
কেউ কারুর নয় পর!

গিলে গিলে খায় বায়ু কিংবা আয়ুমাখা জল,
জ্যোতিষগুলো কতো না চিত্র ধরে রাখে তার ছল।
শীতের শিশির ভেজা বুকে
হয় নদীর উত্থান,
মহামারী বিষে টেনে আনে
বিপদ, মুক্তির গান!

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

ভোর

উড়িয়ে দিয়েছি ফুল
জ্যোৎস্নায় পুলকিত চাঁদ
হাতছানি দেয়।

বাতাস ছুঁয়েছে শরীর
হিম স্পর্শে শিথিল কুসুম
দুচোখে নির্নিমেষ
অবাক চাহনি.....

এ তমসা কেটে গেলে
একদিন দেখা দেবে নবীন সকাল

শ্যামলকুমার বিশ্বাস

পটবদল

যানবাহনেরা নেই, মানুষও তেমন নেই পথে,
অদৃশ্য পাখিরা ফের লোকালয়ে বেরিয়ে পড়েছে।
কলপাড়ে, জানলায়, ছাদের কার্নিশে—চিলেঘরে
শোনা যাচ্ছে তাদের কূজন।

মানুষ খুশিও নয়, বিরক্তও নয়
এরকম অদ্ভুত জটিল প্রতিবেশে;
পাখিরা তাদের খুশি জানাতে এসেছে।

প্রকৃতিশ্রেষ্ঠ জীব দর্পণে কিছু দেখল কি?

গ্রন্থ আলোচনা

সুমিত্রা চৌধুরী

করোনা কালে একটি জরুরি বই

গ্রন্থের নাম : করোনা ডায়েরি

লেখক : অজয় মজুমদার

প্রকাশক : বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা
কাঁচরাপাড়া

যোগাযোগ : ৯৪৩৩৭৩১৮০১

মূল্য : ৩০০ টাকা।

বিগত বছরটা এক অবিশ্বাস্য আতঙ্কের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছিলাম এবং এখনও চলেছি। বিশ্বত্রাস করোনা অতিমারীর প্রকোপে পৃথিবী জুড়েই আতঙ্কের আবহাওয়া।

চিনের হুবেই প্রদেশে প্রথম চিহ্নিত হওয়া এই ভাইরাস (নভেল করোনা ভাইরাস) তিন-চার মাসেই ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে, আন্টার্কটিকা বাদ দিয়ে পৃথিবীর সবক'টি মহাদেশে।

এমন একটি সময় বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনা থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বই 'করোনা ডায়েরী' প্রকাশিত হল। লেখক অজয় মজুমদার। লেখক-এর আগেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বই লিখেছেন।

বইটিকে লেখক দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এছাড়াও আছে শেষের কথা। প্রাককথন এবং অধ্যাপক ড. সিদ্ধার্থ জোয়ারদারের একটি সুলিখিত তথ্যপূর্ণ ভূমিকা। প্রথম অধ্যায়ে ভাইরাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়ে লেখক জানিয়েছেন অতিমারীর ইতিহাস। ৪৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এথেন্সের ভয়াবহ প্লেগ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত।

বইটির ১৫ পাতায় ২০ নম্বর পংক্তিতে লেখা হয়েছে 'প্রথম করোনা অতিমারী..... বা এশিয়াটিক কলেরা'র প্রাদুর্ভাব হয়। পরের প্যারায় লেখা হয়েছে 'আবার ১৯১৮-১৯২০ সালের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা অতিমারী, যাকে স্প্যানিস ফ্লু বলা হয়'।

এখানে 'এশিয়াটিক কলেরা' ব্যাকটিরিয়া ঘটিত রোগ এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ঘটিত রোগ। এই অতিমারীর ঠিক একশো বছর পরের অতিমারী আজকের করোনা ভাইরাস ঘটিত কোভিড ১৯। এই অধ্যায়েই জানা যাচ্ছে একুশ শতকের ভাইরাস আক্রমণের একটি তালিকা, করোনা ভাইরাসের ইতিহাস, প্রাণী উৎস, করোনার জিনোম, কিভাবে ছড়ায়, ভাইরাস সংক্রমণের রোগলক্ষণ, মোকাবিলার ক্ষমতা, শিশু ও বৃদ্ধদের সমস্যা এবং বিশ্বব্যাপী গবেষণার গতিপ্রকৃতি। সব মিলিয়ে প্রথম অধ্যায়টি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয় অধ্যায় শুধু একক ব্যক্তি নয় পরিবার, প্রতিবেশী, অঞ্চল, শিক্ষাক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্রে সংক্রমণ ঠেকানোর উপায়। তবে একটি শব্দযুগল 'সামাজিক দূরত্ব' ব্যবহার না করাটাই সমীচিন। মানুষ নিজের প্রয়োজনেই যুথবদ্ধ হয়েছে, গঠন করেছে সমাজ। সেই মানুষই আজ সামাজিক দূরত্ব তৈরি করে পারস্পরিক সম্পর্কও ছিন্ন করছে। সামাজিক দূরত্ব নয় আমরা বজায় রাখব শারীরিক দূরত্ব এবং এর সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে মাস্ক, স্যানিটাইজার, হাত ধোঁয়ার সাবান। তৃতীয় অধ্যায়ের একটি উপশিরোনাম আছে—'করোনা শেখালো সকলের তরে সকলে আমরা'। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে সামাজিক ও মানবিক নৈকট্যের কথাই বলা হয়েছে। যেমন পরিযায়ী কর্মহীন চলমান শ্রমিকের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন বহু মানুষ। এর পরের অধ্যায়ে লেখা হয়েছে করোনার উৎপত্তি নিয়ে নানা মত—এটা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ভাইরাস না গবেষণাগারে তৈরি করা ভাইরাস! দ্বিতীয়টির কোনো প্রমাণ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। পঞ্চম অধ্যায়ে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন দেশের করোনা আক্রমণের পরিসংখ্যান। তবে এই পরিসংখ্যান সম্ভবতঃ এপ্রিল-মে (২০২০)-র। পরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

পরিসংখ্যান এবং করোনা জনিত সংকট বদলেছে। তবে মায়াপুরের কৃষ্ণভক্তদের কথা বাদ দিলেও এই অধ্যায়ের গুরুত্ব কিছু কমতো না। ষষ্ঠ অধ্যায় 'সংক্রমণ প্রতিরোধে লকডাউন' শুরু হয়েছে একটি কবিতা দিয়ে। বাংলা ভাষাতেও নতুন একটি শব্দবন্ধ তৈরি হল লকডাউন। আলোচিত হয়েছে লকডাউন, লকডাউন জনিত রোগব্যাধি, এর শারীরবৃত্তিয় ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে লকডাউনের প্রভাব। লেখক অত্যন্ত সংবেদনশীলতার সঙ্গে লকডাউনে পরিযায়ী শ্রমিক, ইটভাটা শ্রমিক বা চাকরির দরজা বন্ধ হওয়া মানুষের কথা শুনিয়েছেন। আবার লকডাউনের ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফিরে আসার কথাও জানা যায়। কোভিড ১৯ ও করোনা ভাইরাস গবেষণার কথা বলা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। দেশে বিদেশে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসক দিবারাত্র নিরলস পরিশ্রম করছেন করোনার প্রতিষেধক ওষুধ এবং প্রতিরোধক ভ্যাকসিনের জন্য। চলছে লক্ষ লক্ষ মানুষের ডিএনএ সিকোয়েন্সিং-এর তথ্যভান্ডার তৈরির কাজ। তবে প্রতিষেধক হিসাবে যেহেতু অন্যান্য রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত ওষুধ নিয়ে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে সুতরাং এদের নাম উল্লেখ না করাই সমীচীন। প্রতিরোধক হিসাবে অন্য রোগে ব্যবহৃত ভ্যাকসিন, করোনায় মৃত মানুষের রক্ত প্লাজমা ব্যবহার করে অ্যান্টিবডি তৈরি ইত্যাদি অনেক পরীক্ষামূলক তথ্য বইটিতে পাওয়া যাবে। আরেকটি কথা এখানে বলা দরকার ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড লেখার সময় বেশ কয়েকবার শুধু 'ওমেগা থ্রি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে জনসংখ্যার একটি আকর্ষণীয় তথ্য দেখা যায়। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী দেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনঘনত্ব ৩৮২ জন।

আর পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব ১০২৮ এবং কলকাতার ২৪৩০৬ জন। ফলে করোনা আক্রমণের হার স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গে বেশি হওয়ার কথা কিন্তু মার্চ ২০২১-এ দেখা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রে, দিল্লি, কর্ণাটকে করোনা আক্রান্তের হার অনেক বেশি।

নবম অধ্যায়টি একেবারে অন্য স্বাদের। সত্য ঘটনা অবলম্বনে (পাঁকুড় হত্যা মামলা) লেখক সুনিপুণ লেখনীতে যেন একটি টানটান উত্তেজনার গোয়েন্দা কাহিনি রচনা করেছেন। যেখানে বড় ভাই ষড়যন্ত্র করে চুরি করা প্লেগের জীবাণুর সাহায্যে ছোট ভাইকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হত্যাকারী ধরা পড়ে। কাহিনিটি চমকপ্রদ, বর্ণনা নির্ভুল কিন্তু শিরোনামে ভাইরাস ও ব্যাকটিরিয়ায় গন্ডগোল। শিরোনাম—'খুনী ভাইরাস ও রাজনীতি'। অথচ প্লেগ ভাইরাস ঘটিত রোগ নয়, জীবাণু ঘটিত রোগ (Bacteria Tersinia pestis)। ভাইরাস আর ব্যাকটিরিয়ার এই গোলমাল অন্য জায়গায়ও দেখা গেছে—জীবাণু ঘটিত রোগ হিসাবে চিহ্নিত এইচ আই ভি, নিপা, ইবোলা আদতে ভাইরাস ঘটিত। শেষ অধ্যায়ে বেশ কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। বইটি লেখার মূল লক্ষ্য করোনা নিয়ে সঠিক সমাজ সচেতনতা প্রচার ও প্রসার করা। সেদিক থেকে বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে—বর্তমান ও ভবিষ্যতে।

বইটি লেখার জন্য লেখক অজয় মজুমদারকে এবং প্রকাশক বিজ্ঞান অন্বেষক প্রকাশনাকে সাধুবাদ জানাই। ভবিষ্যৎ সংস্করণের জন্য কিছু অনুরোধ রইল। পূর্বে উল্লেখিত ছোটখাটো ভুলগুলি সংশোধন করে নেওয়া। পুনরুক্তি যথাসম্ভব বাদ দেওয়া এবং কলেবর কিছুটা হ্রাস করা, তাহলেই বইটি আকরগ্রন্থ হয়ে উঠবে।

M. 9830123002

প্র বী র ব সু

ব্র্যান্ড ওষুধ বনাম জেনেরিক ওষুধ

"২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য"—১৯৭৮ সালে এই ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষও স্বাক্ষর করেছিল। পাশের দেশ শ্রীলঙ্কাও তার দেশের নাগরিকদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে, কিন্তু আমরা সে পথে হাঁটছি না। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল ২০১১ সালে হিসাব করে দেখিয়েছেন কিভাবে স্বাস্থ্য খাতে সরকারি ব্যয় বাড়িয়ে সরকারি পরিকাঠামোতেই সমস্ত নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সম্ভব। সবার জন্য স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কিউবার পর কানাডা, নেদারল্যান্ড, আরব আমিরশাহী, অস্ট্রেলিয়া, ইতালি, সাইপ্রাস, স্পেন, আইসল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড প্রভৃতি দেশে সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মকান্ড সাফল্যের সঙ্গে চলছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের ৪২টি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ দেশে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা মরীচিকার মতো মনে হচ্ছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বরাদ্দ কিছুটা বাড়িয়ে ১.৫৮ শতাংশ করা হয়েছে। বলা হল সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিজের কেন্দ্রীয় ভূমিকা ত্যাগ করে মূলত ম্যানেজার হিসাবে কাজ করবে। বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য বিমার ভূমিকা এক্ষেত্রে হবে প্রধান। স্বাস্থ্য বিমা এক্ষেত্রে কোনো সমাধান নয়। এটা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ব্যবসায় পরিণত করে ক্রমে ক্রমে এ ব্যবস্থাকে দুর্নীতিগ্রস্থ করে তুলবে এবং তুলছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূলে দাঁড়িয়ে যে ওষুধ, সেই ওষুধ দিনে দিনে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে।

জেনে রাখুন ওষুধের আসলে তিনটে নাম। প্রথম নামটি পুরো রাসায়নিক নাম, যা কাজে লাগে রসায়নবিদদের। দ্বিতীয় নামটি জেনেরিক নাম। এই নাম ব্যবহার করা হয় ওষুধ বিজ্ঞানসহ চিকিৎসাবিদ্যার অন্যান্য শাখার আলোচনায়। জেনেরিক নামের আসল অর্থ গোত্র নাম। আমাদের ভারতবর্ষে ওষুধের ক্ষেত্রে জেনেরিক নাম অর্থাৎ আসল গোত্র বা গোষ্ঠীর নাম না বুঝিয়ে একটি ওষুধের নাম বোঝানো হচ্ছে। তাই জেনেরিক নামের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। তৃতীয় নামটি হল বাণিজ্যিক নাম। একটি ওষুধের বাণিজ্যিক নাম অবশ্য একটি নয়। একই ওষুধকে আলাদা আলাদা ওষুধ কোম্পানি আলাদা আলাদা নাম দেয়। যেমন নিরাপদ ব্যথার ওষুধ হল প্যারাসিটামল। আর ব্যথার সঙ্গে ফোলা, লাল ভাব, গরম ভাব থাকলে অর্থাৎ প্রদাহ হলে নিরাপদ ওষুধ হল আইবুপ্রোফেন। কিন্তু একসঙ্গে একাধিক ব্যথা কমানোর ওষুধের ব্র্যান্ড ওষুধ ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। বাজারে সর্দি-কাশির ওষুধ বলে প্রচলিত মিশ্র ওষুধ ব্র্যান্ড ওষুধ হিসেবে চলছে প্রায় ১৬টি। ডায়াবেটিসের ব্র্যান্ড মিশ্র ওষুধ অন্ততপক্ষে ২৭-২৮টি রমরমিয়ে চলছে। যাইহোক, একটু উদাহরণ দিয়ে বলতে গেলে প্যারাসিটামল এই ওষুধটির

কেমিক্যাল নাম—এন (৪-হাইড্রোক্সিফিনাইল) অ্যাসিটামাইড। জেনেরিক নাম—প্যারাসিটামল, আবার ব্র্যান্ড নাম—ক্যালপল/ক্রোসিন/প্যারাসেফ প্রভৃতি।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মনে করে কাশির জন্য আলাদা করে কোনো ওষুধের প্রয়োজন নেই। কাশির ওষুধ বলতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকায় ছিল শুকনো কাশির দমক কমানোর জন্য একটি ওষুধ। কিন্তু এই ওষুধটিও ২০০৩-এর ওষুধের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বাজারে চালু কাশির ওষুধগুলোতে নানারকম অ্যালার্জির ওষুধ, কফকে বার করার ওষুধ, কফকে পাতলা করার ওষুধ, হাঁপানির ওষুধ মেশানো থাকে। হাঁপানির ওষুধ টারবুটালিন বা সালবুটামল সংকুচিত শ্বাসনালীকে প্রসারিত করে। অনেক কোম্পানি কাশির ওষুধে এগুলোকে মিশিয়ে বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে যেমন গ্রিলিংটাস, বি-এম, ভেন্টোরলিন এক্সপেক্টোরেন্ট বাজারে চালাচ্ছে। একটি বিষয় ভাববার যে কাশির ওষুধে কফকে বের করার ও কফকে পাতলা করার ওষুধের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে কাশির দমক কমানোর ওষুধ। এই দুই ধরনের ওষুধের কাজ সম্পূর্ণ বিপরীত। হাঁপানির ওষুধ শ্বাসনালীকে প্রসারিত করে। অ্যালার্জির ওষুধ শ্বাসনালীকে শুকিয়ে দিয়ে তার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।

ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় প্রধানত তিন ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়। সালেফানিল ইউরিয়া গোত্রের ওষুধ গ্লিবেনক্লামাইড, গ্লিপ্লিজাইড বা গ্লিমিপিরাইড, বাইগুয়ানাইডস গোত্রের মেটফরমিন বা প্লায়োগ্লিটাজন।

এই ওষুধগুলির খাওয়া ধরনও আলাদা। সালফোনিল ইউরিয়া গোত্রের ওষুধ খেতে হয় খাওয়ার আগে দিনে একবার বা দুবার। মেটাফরমিন খেতে হয় খাওয়ার পরে। দিনে দুবার বা তিনবার। আর পায়োগ্লিটাজন দিনে একবার। এই ওষুধগুলি একাধিক একসঙ্গে মেশালে সেবন করার বিশেষ অসুবিধা। সেবন করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য।

এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য দপ্তর নিযুক্ত বিশেষজ্ঞরা বলছেন এই মিশ্রিত ওষুধগুলি ক্ষতিকর এবং এগুলির নিরাপদ বিকল্প ওষুধ রয়েছে।

এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপের মিশ্রিত ব্র্যান্ড ওষুধ এবং মনোরোগের মিশ্রিত ওষুধগুলিও ক্ষতিকর এবং এগুলিও নিরাপদ বিকল্প রয়েছে।

গরিব মানুষের নাগালে ওষুধকে আনতে হলে জেনেরিক নাম অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম ছাড়া গতি নেই।

কেবল জেনেরিক নামেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইপত্র পড়াশোনায় ডাক্তাররা ব্যবহার করেন।

বাজারে যে অসংখ্য ওষুধের মিশ্রণে তৈরি প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায় সেগুলির অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। জেনেরিক নামের ওষুধের ব্যবহার চালু হলে ওষুধ কোম্পানিগুলি অধিক সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন করতে বাধ্য হবে।

জেনেরিক ওষুধের নাম দেখে, সেটা কোন ধরনের ওষুধ বোঝা সহজ হবে। একই ওষুধের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামের মিল থাকে না। ফলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

মিশ্রিত ব্র্যান্ড নামের ওষুধের চেয়ে দেখা যায় জেনেরিক নামের ওষুধগুলো অসম্ভব রকম দামে কম হয়।

জেনেরিক নামের ব্যবহারে ডাক্তারবাবুদের অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই চলবে, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হবে না।

জেনেরিক নামের ওষুধ বাজারে চালালে ব্র্যান্ডের প্রচার ও প্রসারে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে না। ফলে খরচ কমবে, ওষুধের দামও কমবে।

এ জন্যই ২০১৭ সালে সুরাটের এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানিয়েছিলেন, "ডাক্তারদের এবার থেকে ওষুধের জেনেরিক নামে প্রেসক্রিপশন করতে হবে, রোগীরা যাতে দামী ব্র্যান্ড কিনতে বাধ্য না হন। প্রেসক্রিপশনে ক্যাপিটাল অক্ষরে বড় করে লিখতে হবে, যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওষুধ লেখেন ডাক্তারবাবু। প্যারাসিটামল বা ডায়ারিয়ায় নুন-গ্লুকোজ ব্যবহার এগুলি স্বাস্থ্যকর্মীরা ডাক্তারদের কাছ থেকেই শেখেন। কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তারবাবুরা আবার বলছেন, জেনেরিক নামে লিখতে বললেও ব্র্যান্ড নামে লিখতে তো মানা নেই। তাহলে ডাক্তারদের উপর চাপ না দিয়ে ব্র্যান্ড নামের ওষুধ বাজারে না রাখলেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়।

একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, সরকারি ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানগুলিতে প্রাপ্ত জেনেরিক ওষুধ ও তার নানান ব্র্যান্ডের কার্যক্ষমতায় কোনো ফারাক নেই। ডাক্তারদের জেনেরিক ওষুধ লেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে জেনেরিক নামে আজকাল ওষুধ উৎপাদিতই হয় না। বড় বড় ওষুধ কোম্পানিগুলোর জেনেরিক ডিভিশনও আজকাল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের উৎপাদিত ওষুধে ব্র্যান্ড নাম দেয় এবং এদের বলা হয় ব্র্যান্ডেড জেনেরিক্স। জেনেরিক ওষুধের প্রেসক্রিপশনে দোকানি তার ইচ্ছামত ব্র্যান্ডেড জেনেরিক ওষুধ দেন। দোকানির লক্ষ্য মূলত ব্র্যান্ডেড ওষুধের লাভের প্রশ্নে। সর্বোপরি বাজারে ব্র্যান্ড নামে ওষুধ না থাকলে কোনো ডাক্তার সেক্ষেত্রে প্রেসক্রিপশনও করতেন না। কাজেই সমস্যার সমাধানের একটা সহজ পথ খুঁজে পাওয়া যেত। জেনেরিক নামে বা আরও সঠিকভাবে বললে, আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নামে, ওষুধ মানুষের হাতে পৌঁছোক—এটাই সাধারণ মানুষের কাম্য।

email:prabirchandrabasu54@gmail.com • M. 9830676330

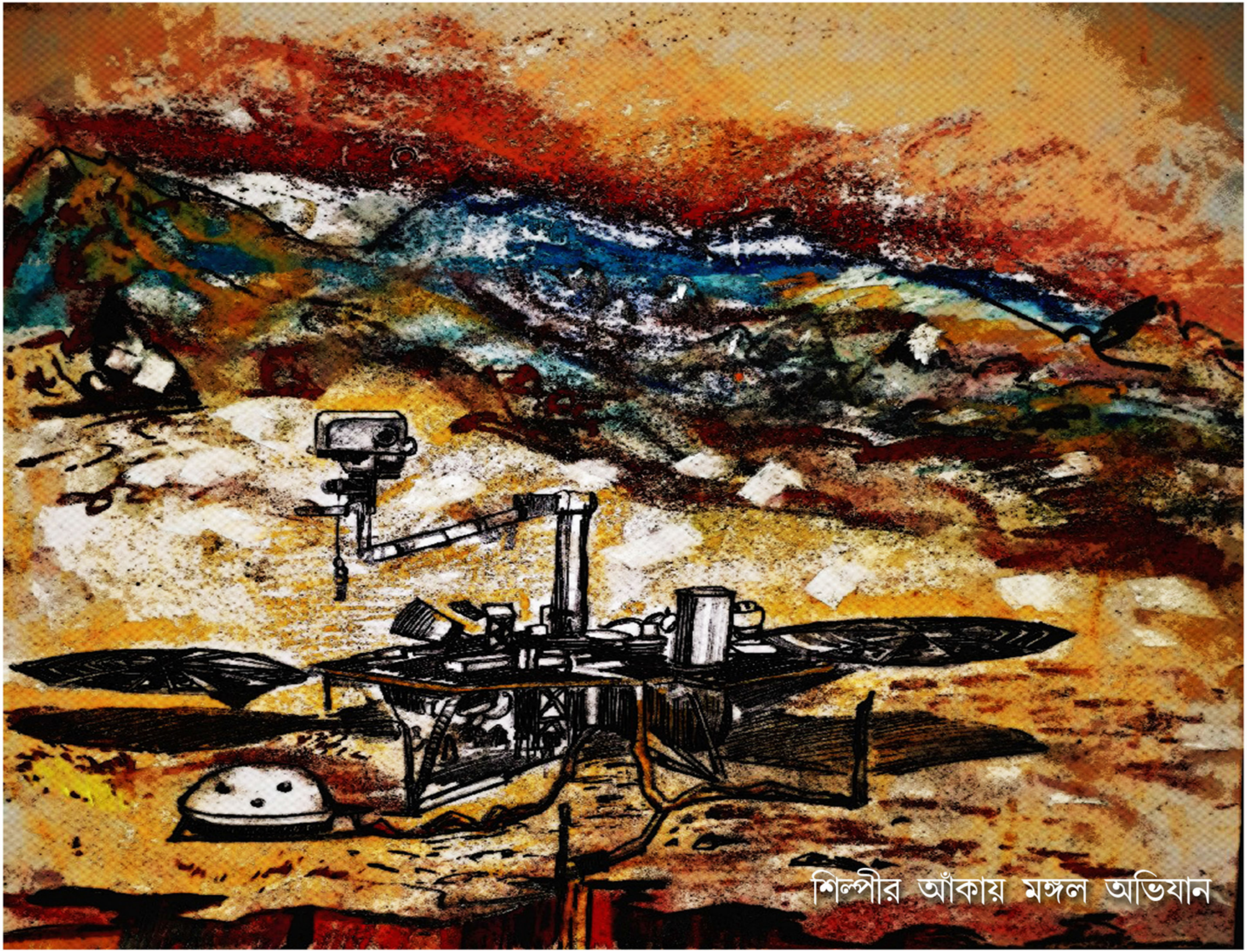
শিল্পীর আঁকায় মঙ্গল অভিযান

BIGYAN ANNESWAK VOL : 18 Issue No. 2,3 March-June 2021 RNI : WBBEN/2003/11192 Rs. 15/-
ISSN 2582-5674

রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

স্তন্যপায়ী **ভারতীয় গন্ডার/একশৃঙ্গি গন্ডার**

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Indian Rhinoceros/Great Indian One Horned Rhinoceros*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Rhinoceros unicornis*

ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডার এখন বিলুপ্তপ্রায়। এদের জনসংখ্যা সারা বিশ্বে মাত্র ৩৫৮৮ (২০১৮)। পৃথিবীর মাত্র দুটি দেশে সীমাবদ্ধ এখন। ভারত ও নেপাল—প্রাগৈতিহাসিক এই প্রাচীন স্তন্যপায়ীর শেষ আবাসস্থল। এর মধ্যে ২৯৩৯টি ভারতের আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের কাজিরাঙ্গা, মানস, পাবিতোরা, জলদাপাড়া, গরুমারা প্রভৃতি বনাঞ্চলে দেখা যায়। নেপালে ৬৪৯ টির মত সংখ্যায় বেঁচে রয়েছে।

উভচর **ঈশিকাওয়া ব্যাঙ**

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Ishikawa's Frog*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Odorrana ishikawae*

জাপানের সবচেয়ে সুন্দর ব্যাঙ এটি। জাপানের 'ওকিনাওয়া' দ্বীপপুঞ্জে কেবলমাত্র দেখা যায় এদের। মূলত উষ্ণ বনাঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী নদীগুলোতে পাওয়া যায়। যদিও এদের আবাসস্থল আজ বড়ই বিপন্ন। ২০১৫ IUCN এদের লাল তালিকায় স্থান দিয়েছে—বিপদগ্রস্ত প্রজাতি রূপে।

পাখি **সাদাপেট নীলদোয়েল**

সাধারণ ইংরাজি নাম : *White bellied blue Robin*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Sholicola albiventris*

এই দৈত্যাকার ট্যারানটুলা বা মাকড়সা মহিশূরের আর্দ্র শুষ্ক বনাঞ্চলে ১৫০০-৩০০০ ফুট উচ্চতায়। এই প্রজাতি কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ২০১৫ সালে এই প্রজাতি নিয়ে কাজ শুরু হয়। এই প্রজাতিটিকে বিপন্ন প্রজাতিরূপে গণ্য করা হয়। ১৮৯৫ সালে প্রথম প্রজাতি আবিষ্কৃত হলেও সেভাবে এতদিন কাজ হয়নি, ফলে বহু অজানা তথ্য এর সম্পর্কে জানা যায়।

অমেরুদন্ডী **মহিশুরের আভুসন ট্যারানটুলা**

সাধারণ ইংরাজি নাম : *Mysore Ornamental Tarantula*

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Poecilotheria striata*

এই দৈত্যাকার ট্যারানটুলা বা মাকড়সা মহিশূরের আর্দ্র শুষ্ক বনাঞ্চলে ১৫০০-৩০০০ ফুট উচ্চতায়। এই প্রজাতি কেবলমাত্র এই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। ২০১৫ সালে এই প্রজাতি নিয়ে কাজ শুরু হয়। এই প্রজাতিটিকে বিপন্ন প্রজাতিরূপে গণ্য করা হয়। ১৮৯৫ সালে প্রথম প্রজাতি আবিষ্কৃত হলেও সেভাবে এতদিন কাজ হয়নি, ফলে বহু অজানা তথ্য এর সম্পর্কে জানা যায়।

email:rajarouthbhbl@gmail.com • M. 9474417178